

বক্তৃতা ।

অধ্যায়

বঙ্গের অদ্বিতীয় ধর্মগুরু

কুমার শ্রী শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজকের

বক্তৃতার সার সংগ্রহ ।

শ্রীভূদেব কংবিরত্ব কর্তৃক

সংকলিত ।

বারাণসী ।

ধর্মামৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত ।

শঃ ১৮১৩ ।

২য় খণ্ড ।

মূল্য ১০ আট আনা ।



প্রবৃত্তিবার্গ ।

নানাদেশের নানাবিদ জনসম্ভার যখন কোন মহামেলায় সম্মিলিত ও সমাজিত হয়, তখন সেই উদ্দেশ্যে পদার্থরাশি দেখিয়া দরিলের চিত্র লোভে নিমুক্ত হয়, মহামেলার সমস্ত মনোরম সামগ্রী একটি ২ করিয়া কিনিতে তাহার সাধ যায় । স্থানস্থান মহামেলার স্তম্ভের বিপনিত্তে সমাজিত পদ্য রাশি সমস্তই আকর্ষণ করিতে তাহার প্রাণ যেন আকুলি বিকুলি করিতে থাকে । সেই কণা এই সংসারক্ষেত্রে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডযগীর অধুত মহামেলায় আসাণের সত লোভে ফোভে অভাবে অভিভূত দীন দরিদ্র জীব গণ সমবেত । মহামেলার মহামেলার এই অনন্ত ভাঙারে প্রাণ মনোমোহন বিচিত্র পদ্যরাশি প্রেরে ২ মাজান রহিয়াছে । তাহার সত্যায় সত্যবান্ নই মূল্যবান সামগ্রী সম্ভারের দিব্য চমকে আমরা আকৃষ্ট । এ উন্মোদন সমস্ত পদার্থই নইবার

জনা প্রাণ যেন লালায়িত। আমরা উত্তম বস্তু চাই বটে,
 কিন্তু উত্তম বস্তু চেনা বড় শক্ত। সময় বিশেষে অবস্থা-
 বিশেষে স্থান বিশেষে লোক বিশেষের যাহা উত্তম,
 অন্যের পক্ষে তাহাই হয়তো মন্দ বোধ হয়, শৈশবে যাহা
 ভাল লাগে, যৌবনে তাহা হেয়, আবার যৌবনে যাহা
 হেয় তাহাই বর্দ্ধকো আবার উপাদেয় বলিয়া বোধ
 হয়। হয় তো তোমার অবস্থাদির অনুকূল হওয়ায়
 তোমার পক্ষে যাহা ভাল, তাহাই আমার অবস্থাদির
 প্রতিকূল হওয়ায় আমার পক্ষে মন্দ। দেশ, কাল,
 পাত্র, অবস্থা নিম্নলিখিত যাহা উত্তম তাহা চিনিয়া
 লওয়া বড়ই কঠিন। অনেক সময় আমরা মন্দকে ভাল
 বলিয়া বুঝি, এবং ভালকে মন্দ বলিয়া পরিত্যাগ
 করি। অনাদি কাল হইতে এই ভ্রান্তি রূপ অনিদ্যা
 বেশের বশীভূত হইয়া জীব এ মহামেলা ক্ষেত্রে ঘুরিয়া
 বেড়াইতেছে।

এই স্রবিস্তীর্ণ সংসার-মহামেলায় জীবের সম্মুখে
 অনন্ত কর্তব্য পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই অসীম

কাৰ্য্যসূত্ৰের মধ্যে কোনটি আমাদের অপরিহার্য্য নিজ
কৰ্ত্তব্য তাহা প্রথমে বুঝিতে হইবে। দোকানে থরে ২
সাজান জিনিষের মধ্যে যেটি আমাদের মনোমত
ও অতি প্রয়োজনীয় উত্তম জিনিষ, তাহাই বাছিয়া
লইতে হইবে। $\frac{1}{7}$ আমাদের পরমায়ু অল্প, আমাদের
শক্তি সামর্থ্য নিতান্তই ক্ষীণ, সুতরাং আমরা দুই দরিদ্র
পথের কাশাল । অনন্ত শাস্ত্রের বিশালগর্ভে অনন্ত
মূল্যবান তত্ত্ব রূপ পণ্য রশি নিহিত আছে। সে সমস্তই
ক্রয় করিবার সাম্য আমাদের নাই। সুতরাং সে সমস্তের
দিকে লোভলোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার প্রয়োজন কি ?
যাহা আমাদের নিজের পক্ষে প্রয়োজনীয়, যাহা আমাদের
নিজের উপকারে আসিতে পারে, তাহাই আমরা দিগকে
বাছিয়া লইতে হইবে। কিন্তু বাছিয়া লইবার উপায়
কি ? আমাদের স্বেচ্ছা আমরা দিগকে যে দিকে লইয়া
যায়, আমাদের প্রবৃত্তি আমরা দিগকে যে পথে পরি-
চালিত করে, তদনুসারে কৰ্ত্তব্য নির্ধারণই কি ঠিক ?
কিন্তু তাহাই বা কেমন করিয়া হইতে পারে ?

আমাদের প্রবৃত্তি বাহ্য চাপ, তাহাই যে আমাদের
 পক্ষে উত্তম, তাহাই যে আমাদের হিতকারী, তাহা
 কে বলিবে? অনেক সময় স্বেচ্ছায় বশবর্তী হইয়া আমরা
 সুখ-ভাবিয়া কুপথে গিয়া পড়ি। প্রবৃত্তির তাড়নায়
 অনেক সময়েই কু-সু বিচার করিবার শক্তি থাকে না।
 সুতরাং স্বেচ্ছায় 'উত্তম' বস্তু নির্বাচন করা বড়ই দুষ্কর।
 কিন্তু জগতের জীব স্বেচ্ছাভিগত উত্তম বস্তু পাইবার
 জগৎই আশ্রিত। প্রবৃত্তি-রাগনিগ্নিত উত্তম পদার্থের
 প্রত্যাশায় জীব আকুলিত। বাহ্য প্রবৃত্তির অশ্রু-কল,
 অথচ "উত্তম", তাহাই পাঠবার অন্য জীবের অনুরাজা
 পিপাস। বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তির মস্তকে পদাপাত করেন,
 আমাদের মত অনধিকারী জীব কিন্তু প্রবৃত্তির দাস।
 সুতরাং প্রবৃত্তিকে আমরা ছাড়িতে পারি না। যে
 প্রবৃত্তি নিজ প্রকৃতির প্রতিকূল, তাহা অবশ্যই পরি-
 হার্য। কিন্তু যে প্রবৃত্তি স্বভাবগুণে চাণিত হইয়া
 প্রকৃতির চাকু চরণ চুবন করিতে পারে, তাহা কখনই
 জীবকে কর্তব্যপদ-মুটে করেনা। প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ

দূষিত পদার্থ নহে। এ পানজ্ঞানায় সংসারে পাড়য়াই
ময়না-মাটিমাখা হইয়া প্রযুক্তি দূষিত বানান হইয়া
পাড়য়াছে। শাস্ত্রস্বাক্ষা পরিপালন রূপ পবিত্র সম্বন্ধে
তাহাকে ধুইয়া পরিষ্কার করণে করিয়া লইতে হইবে।
তাহার সাময়িক কালকুণি মাখা নৃত্ত পারমার্জিত
করিয়া সূচাম সুন্দর করিয়া লইতে হইবে। প্রবৃত্তির
গতি অবদ্যা বিহীন নুথ হইতে ক্রিয়ায়। প্রকৃত
মম্মনীন করিয়া লইতে হইবে। পারমার্জিত প্রবৃত্তি ই
প্রবৃত্তির প্রযুক্তি।

অনেকে মনেহ করিতে পারেন, প্রবৃত্তিকে নিজ
দীপ্তিপথে পথেঘাটেতে না দিয়া তাহাকে সংগত—নিয়মিত
করিলে তাহাতে সুখ কি? প্রবৃত্তির গতি মল্লুচত
করিলে তাহাতে যে অশান্তি আরও বাড়িয়া উঠে।
এ মনেহ নিতান্তই ভ্রমাত্মক। পঞ্চম বর্ষীয় বালক
নৌদ্রে দৌড়ানোড়ি করিতে চায়। পিতা তাহার
দৌড়ান-প্রবৃত্তি সংগত করিয়া তাহাকে দীর্ঘগমন শিক্ষা
দিলেন। এই রূপ প্রবৃত্তির সংগমনে বালকের আপাততঃ

একটু অতৃষ্ণ জাশিল বটে, কিন্তু তাহার পরিণামফল যে সঙ্গলগর জাঁহা বালক এখন বুঝিল না, কিন্তু পরে বুঝিবে। সুতরাং প্রবৃত্তির সংগমনে আপাততঃ একটু হুঃখ হয় বটে, কিন্তু তাহার পরিণাম-ফল সুখময়। স্বেচ্ছাচারী আপনার ক্রিয়াকেই ভাল বাসে, বুদ্ধিমান্গণ ক্রিয়ার পরিণাম-ফলের দিকে তাকাইয়া ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। অপরিণামদর্শী নিমূঢ়চেতাগণ ক্রিয়ার ফল-সন্ধানে অসমর্থ হয়, তাই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে পারেন না-চায়ও না।

২/ আমাদের যাহা মনোরঞ্জনকর—আলস্যশুশ্রূষা, প্রবৃত্তি আমাদিগকে সেইদিকে লটয়া যাউতে চায়, কিন্তু তাহাতে পক্ষ্য কল্যাণলাভের আশা সুদূরপরাহত। আমাদের যাহাতে প্রকৃত মঙ্গল হয়, যাহাতে নিত্য নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ হয় প্রবৃত্তিকে সেই পথের পথিক করা উচিত। মহামেলায় গ্রহণোপযোগী নানাবিধ জ্ঞান প্রস্তুত থাকে। চক্চকে খেলনা দেখিয়া বালকের মন ফুলিয়া যায়। সুতরাং তাহা লইবার জন্য বালক

চকল হয়। কেননা অপরিপক্ক বালবুঁকি জন্য তাই
 তাহার ভাল লাগে। কিন্তু বুদ্ধিমান বহুদর্শী ব্যক্তি
 খেলেনার চমকে ডুলেন না, তিনি তেমন জিনিষ
 বাছিয়া গ্রহণ করেন, যাহা তাঁহার প্রয়োজনীয়, যাহাতে
 তাঁহার ভাল হয়, যাহা তাঁহার নিজের উপকারে
 আসিতে পারে। এ সংসার-মহামেলায় যিনি স্বেচ্ছায়, তিনি
 টুকটুকে মাকালকলের সৌন্দর্য্য ডুলেন না, তিনি
 তেমন জিনিষ প্রবৃত্তির অনুকূল করিয়া লন, যাহাতে
 তাঁহার মঙ্গল হয়। সুতরাং প্রবৃত্তির সকল কথাই শুনিলে
 চলিবে না। স্থলবিশেষে প্রবৃত্তির বল্গা সংযত করিতে
 হইবে। গুরুজনের নির্দেশানুসারে, শাস্ত্রে উল্লিখিতানুসারে
 প্রবৃত্তিকে সঙ্গঠিত ও স্পষ্টে চালিত করিতে হইবে।
 কিন্তু অভিমানে পরিপূর্ণ জীব নিজপ্রবৃত্তিকে এতই
 অতিক্রম মনে করেন, যে তিনি কাহারও কথা না শুনিয়া
 স্বৈচ্ছার স্বাধীনতাই দিতে চাহেন। অভিমানই সাহার
 সর্ব্বত্র, তাহার পদতলে শাস্ত্র-আজ্ঞা, গুরুশাস্ত্র, সাধু-
 দিগের সত্বপদেশ ঘাশি নিমজ্জিত হইবে, তাহাতে

আর আশ্চর্য্য কি ? যাহার দোকানে যে বস্তু অধিক,
 সে তাহাতে সম্মুখে মাজাইয়া রাখে । ক্রেতাকে তাহাতে
 দিয়া যে পরিভৃপ্ত করিতে চায় । সেই রূপ যাহার
 সাধুতা বিদ্যুৎ মাত্র নাই, অভিমানই অধিক; সে নিজের
 দোকানে অভিমানের পশারাই মাজাইয়া রাখে । সুতরাং
 তাহার কাছে অভিমান ছাড়া আর কি পাওয়া যাইতে
 পারে ? যে যে দরের লোক, সে সেই রূপ দরের
 লোকের মণ্ডলীতেই ঘুরিয়া থাকে । যাহার সর্ব্বাদা
 নীচ, সে নীচ শ্রেণীর মণ্ডলীতেই যাইতে স্তম্ভ বোধ
 করে । অভিমানের সঙ্কীর্ণ সর্ব্বাদা যাহার সম্বল, তাহার
 নিরভিমান অনন্ত সর্ব্বাদার অপার পর ব্রহ্মের দিকে
 কেনন করিয়া পতি হইতে পারে ? তাই বলিতেছি,
 অভিমান পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র আত্মা অশ্রুমাতে
 প্রবৃত্তিকে সংগত—সমার্জিত করিয়া লইতে হইবে ।
 ঘবকষার কোন সামান্য জিনিস ব্যবহার করিতে
 হইলে আসবাব তাতা দৌড় করিয়া—সমার্জিত করিয়া
 লই । আর অনন্ত ব্রহ্মের উচ্চ দরবানে যাইবার জন্য

যে আবৃত্তিকে আমরা ব্যবহার করিতে চাই, তাহাকে
 মৌত করিয়া লইতে হইবে না, এ কোন কথা ? স্বভাব-
 সূত্রে আবৃত্তিকে আমরা পাঠিয়াছি, শুধু তাহা ত্যাগ
 ত্যাগ করিতে পারিব না, ইহা ঠিক । কিন্তু তাহাকে
 পরিমার্জিত করিয়া নিজ জীবনের অবশ্য কল্প্যমাণো-
 পযোগিনী করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে । যাহা
 আমাদের আভাবিক, তাহা ত্যাগ করা অসম্ভব ।
 আমরা স্বভাবসূত্রে চক্ষুরদৃষ্টিশক্তি পাঠিয়াছি । ক্ষীণতা-
 লোকে উনমুক্ত চক্ষুর সম্মুখে অনাৰ্থ অর্পিলেই দৃষ্টি-
 শক্তির তাহা গোচর হইবেই চইবে । শত চেষ্টা
 করিলেও এ দৃষ্টিশক্তির গতি কেহ রুদ্ধ করিতে
 পারিলে না । সেই রূপ স্বভাবসূত্রে কতকগুলি সংস্কার
 আমরা স্বয়ং কর্মসূত্রে পিতা মাতার কাছ হইতে
 ও অন্যান্য নানা কারণে পাঠিয়াছি । স্নেহ, মায়া, মমতা,
 ক্রীতি আবৃত্তি আদি সমস্তই পাঠিয়াছি । এই আভাবিক
 বৃত্তিগুলিকে একবারেই পরিহার করিব কেমন
 করিয়া ? স্বভাবসূত্রে শরীরের আয়ত্ত লইয়া যে

জন্মিয়াছে, শত চেষ্টা করিলেও তাহা একবারে উঠাইতে পারা যায় কি ? উঠাইতে পারা যায় না, কিন্তু মাজিয়া ঘসিয়া পরিকার পরিচ্ছন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সেই রূপ স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কারকে শত শিক্ষা দিলেও উঠাইতে পারা যাইবে না, কিন্তু শিক্ষার শুধে মার্জিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বৈদান্তিক প্রবৃত্তিকে তুচ্ছ নিষ্কৃতি আবর্জনা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহেন, আমরা কিন্তু তাহা চাহি না। যে মাটি—যে কর্দমকে তোমরা আবর্জনা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাও, যিনি উপাসক, তিনি সেই মাটিতে শিবলিঙ্গ নিম্নাণ করিয়া নিজের নামের উপাস্য দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন। যে সংস্কার—যে প্রবৃত্তিকে তোমরা আবর্জনা—সংসারবন্ধনের হেতুভূত বলিয়া ত্যাগ করিতে চাও, আমরা তাহাকে শিবলিঙ্গের নাম সঙ্গীকারাকরিত করিয়া ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে চাই—সংসার বন্ধন মোচন করিতে চাই। সুতরাং যখন পিতৃাকারে থাকে, তখন তাহার

ব্যবহার হয় না। সত্য, কিন্তু ভাষা যখন স্বর্ণকারের হাতে পড়ে, তখন অলঙ্কার রূপে পরিণত হইয়া সে সুবর্ণ বরনীর কাঙ্ক্ষিত দিব্যমূর্তিতে উদ্ভাসিত হয়। সেই রূপ ভগবৎ-প্রসাদে এই মনুসাদেহে অনেক স্তবর্ণ লইয়া আমরা জন্মিয়াছি। একত শিল্পনিপুণ স্বর্ণকারের সাহায্যে সে স্তবর্ণে বিচিত্র অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে হইবে। সে অলঙ্কাররাশি অঞ্জলি পুরিয়া জগন্মাতার অলঙ্কককুম্ভামরপ্রসূত চরণাম্বুজে যে দিন উপহার দিন, সেই দিনই স্নান মিটিয়ে, প্রসূতি চরিতার্থ হইবে। তখন প্রসূতি নিবৃত্তিকে নিরাশ করিয়া নিঃশীর্ণ নিকেতনে ভোমান নিবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

× পূর্বেই বলিয়াছি, প্রবৃত্তিকে মূল প্রকৃতির অনুকূল করিয়া লইতে হইবে। জীবের ক্ষুদ্র প্রকৃতি নীরবে মূল প্রকৃতির দিকে যখন ফিরাইয়া সতৃষ্ণ ভাবে বাহ্য চায়, সেই প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য প্রবৃত্তি সর্বদা পরিচর্যা করিতে থাকিবে। মূল প্রকৃতিকে

উন্মত্ত কারিয়া প্রবৃত্তি যাহাতে তদাভিযুগীন হয়, সেই
 রূপ নিষ্কর্তৃক ব্যবস্থা করিতে হইবে । ভ্রান্ত হইয়া
 শিশু প্রথমে ক্ষুধায় কাতর হইয়া যখন কাঁদিয়া উঠে,
 সে তখন বুঝিতে পারেনা কিসের জন্য সে কাঁদিতেছে,
 তাহার কি ক্রেশ হইতেছে । কি পাইলে তাহার কামা
 নিবৃত্ত হইতে পারে, সে তাহা জানে না । তাহার
 শারীর প্রকৃতি কি অস্বাভাবিক হইয়াছে, তাহা সে
 বুঝিতেছে না । অপরকে মুখ ফুটিয়াও বুঝাটতে
 পারিতেছে না । তাহার প্রাণ কিসের জন্য ব্যাকুল
 সে তাহা না বলিতে পারিলেও তাহার ক্ষমাভঙ্গল
 শারীর প্রকৃতি নীরব ভাষায় তাহা বলিয়া দিতেছে ।
 সেই প্রকৃতির জননী মূলপ্রকৃতি অর্থাৎ বালকের
 মাতা শারীর প্রকৃতির সেই গুহ্য মঙ্গলগাথা বুঝিতে
 পারেন । তাই তিনি স্তন লইয়া বালকের মুখে দেন,
 সে স্তন চুষিয়া চক্ষু পান করিবার জন্য শিশুর প্রবৃত্তি
 স্বভাব ফুটিয়া উঠে । শিশুর ক্ষমাভঙ্গল শারীর প্রকৃতি
 দুগ্ধদায়ক পরিচরিত হইয়া প্রকৃত হয় । শিশুর শারীর-

প্রকৃতর ক্ষুধারূপ তাৎকালিক অভাব যেমন মাতার
 স্তন্যপানে পূর্ণ হয়, সেই রূপ জীবপ্রকৃতির অভিস্রবণে যে
 অভাবের কথা—যে স্থানের মস্ত্রাগত ক্ষুধা—যে অহৃৎপি
 অনাদিকাল হইতে অশুভগলিলা ফল্গুনদীর মত সূক্ষ্ম-
 রূপে প্রবাহিত হইয়া আগিতেছে, সে অভাব—যে
 অহৃৎপি অগম্যতা। মূলপ্রকৃতি বা অমপূর্ণার স্তন্য-
 পানে যে দিন পারিতৃপ্ত হইবে, সেই দিনই জীবের
 কামা থাকিবে, কোলাহল—কলরব বন্ধ হইবে,
 ইন্দ্রিয়-চাপলা, মন-চঞ্চল্য স্থিতি হইয়া আগিবে,
 কদম্ব সুশীতল হইবে, মৃৎ দীর্ঘপাতি বিনিবৃত্ত
 হইয়া ঘাইবে। মায়ের কোলে মায়ের চোলে চির-
 দিনের জন্য ঘুমাইয়া পড়িবে। সচেতনে শান্তিসমূহা-
 পানে অচেতন হইয়া থাকিবে। শিশুর শরীরপ্রকৃতি
 ক্ষুধার যন্ত্রণার কাতর হইয়া মায়ের দিকে তাকাইয়া
 যেমন কাঁদিয়া উঠে, সেই রূপ জীবপ্রকৃতি গুরুদল
 উপদেশে নিজের চিরদিনের মস্ত্রাগত অভাব—স্থানের
 মস্ত্রাগত ক্ষুধা কাগত করিয়া মূলপ্রকৃতি অগম্যতা। অম-

পূর্ণার চরণ তলে মাথা রাখিয়া। যে দিন কাঁদিয়া উঠিবে,
 সেই দিনে দৃষ্টিপূর্ণবরকাঞ্চনদব্বীহস্ত। রাজরাজে-
 স্বরীর মায়ের দৃষ্টিমুগ্ধ ধারায় জীবের আকাজক্ষা—
 প্রবৃত্তিপ্রবাহ চরিতার্থ হইবে—চিরদিনের সাধ মিটিবে।
 অনন্তপ্রকৃতিরূপিণী মা ক্ষুদ্র জীবপ্রকৃতিকে পরিতৃপ্ত
 করিবার জন্য—প্রকৃতির অনুগামিনী প্রবৃত্তিকে
 চরিতার্থ করিবার জন্য সর্বদাইত উন্মুখী হইয়া
 রহিয়াছেন, কিন্তু আমাদের প্রবৃত্তি মাগুখী না হইয়া—
 প্রকৃতির অভিযুগী না হইয়া চিরদিনই বিকৃতির পথে
 চালিত হইয়া আসিতেছে। শাস্ত্রের আদেশে গুরু
 নিদেশে প্রবৃত্তিকে প্রকৃতির গম্মুখীন করিতে হইবে,
 প্রবৃত্তির দ্রোহ উল্টাইয়া দিতে হইবে। মানবের
 ব্যক্তিগত প্রকৃতির গুহ্যতত্ত্ব যিনি বুঝিতে পারেন,
 কোন্ উপাদানে—কোন্ গুণের কি রূপ অংশে কাহার
 প্রকৃতি গঠিত, প্রকৃতি কোন্ দোমে উহা অনাদ্যা
 প্রকৃতির সহিত গন্মিলিত হইতে পারিতেছে না, ও
 কোন্ ঔষধেই বা এই রোগ নিবৃত্ত হইবে, এতাবৎ

যিনি সমাগ্ন রূপে অবগত আছেন, প্রকৃতিকে তাঁহারই
কথানুসারে পরিচালিত করিতে হইবে। তাহা হইলে
প্রবৃত্তি আর বন্ধনের হেতু হইবে না।

কেহ ২ আশঙ্কা করিতে পারেন, আমাদের প্রবৃত্তি
কোন পথে চালিত হইলে কি রূপ স্তম্ভ লাভ হয়,
আমরা চিন্তা করিয়া তাহা বুঝিতে পারি। তাহাতে
গুরুউপদেশ, শাস্ত্রকর্তা ব্যাগবশিষ্ঠের উপদেশ শুনিবার
প্রয়োজন কি ! তাঁহারা হস্তপদনিশিষ্ট মানুষ,
আমরাও মানুষ, তাঁহাদের বুদ্ধশক্তি বিচারশক্তি
চিন্তাশক্তি ছিল, আমাদেরও আছে। সুতরাং
তাঁহাদের সহিত আমাদের এমন কি বিভিন্নতা আছে,
যে তাঁহারা সকল বিষয়ে মঙ্গলামঙ্গল আমাদের
অপেক্ষা বেশী বুঝিতেন। এমন কি পার্থক্য আছে যে
তাঁহাদের কথা মানিতেই হইবে। এ আশঙ্কার আর
উত্তর দিব কি ? জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিগণকে আমাদের সমান-
স্তরে যিনি আনিতে চাহেন, তিনি নিতান্তই অসম্ভব
বাহুল। ঋষিদের সহিত আমাদের প্রভেদ বিস্তর।

পরীক্ষা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায় । দৃষ্টান্ত
 দিয়া কথাতো বুঝাইতেছি । একটা লৌহনির্মিত সূচিকে
 চুম্বকে ঘর্ষণ করিলে তাহাতেও আকর্ষণী শক্তি
 সঞ্চার হয় । সে চুম্বকই প্রাপ্ত হয় । সেই চুম্বকই প্রাপ্ত
 (Magnetized) সূচিকে অপর একটা লৌহনির্মিত
 সূচির নিকট রাখিয়া দেখিলে দুইটিকেই সমান
 বলিয়া বোধ হয় । কেননা দুইটির আকৃতিগত কোন
 পার্থক্য নাই । কিন্তু পরীক্ষার নিকটে কসিলে দুইটির
 পার্থক্য স্পষ্ট বুঝা যায় । অপর একটা লৌহনির্মিত
 সূচিকে সেই দুইটির কাছে আন দোখ, দেখাবে, সে
 ছুঁচটি সেই আকর্ষণী শক্তিমগ্ন সূচির দিকেই ঘোড়িয়া
 যাইবে কেননা সে তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে ।
 তখন অপর ছুঁচটির স্বভাব প্রকাশিত হইয়া পড়ে ।
 তখন বুঝিতে পারা যায় উভয়ের আকৃতি গত
 সাদৃশ্য থাকিলেও প্রকৃতিগত—শক্তিগত কত পার্থক্য ।
 সেই রূপ তোমার আনার গহিত ব্যাগ বিশিষ্টের
 আকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও প্রকৃতিগত সামান্য শক্তি-

গত বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। বেদন্যাস মাগ্নেটাইজ্‌ড
 ছুঁচ আর ভূমি আমি কেবলই ছুঁচ [অর্থাৎ ছুঁচো]
 বেদন্যাসের “তামসী” শক্তি তাঁহাকে বরনীয় কাম্যাকে,
 তাঁহার প্রকৃতি গঙ্গার মাগর সঙ্গের ন্যায় অনাদ্য
 প্রকৃতির সহিত অভিন্ন ভাবে সম্মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।
 তাই জগৎ তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া দৌড়িতেছে।
 আর আমাদের “তামসী” শক্তি আমাদেরকে জড়বুদ্ধি
 ও মলিন করিয়া তুলিয়াছে। তাই আমরা দিন ২
 জগতের বাহির হইয়া পড়িতেছি। স্বতরাং প্রত্যেক
 নিম্নতর। স্বর্গ ও নরকে আকাশ ও পাতালে যত পানি
 প্রভেদ, বেদন্যাস ও আমাদের মধ্যে ততখানি প্রভেদ।
 আমরা নরকের কাঁট হইয়া দেবতার আগনে পলিত
 যাই। শৃগাল হইয়া সিংহের অধিকার কাড়িয়া লইতে
 চাই। আমাদের এ অপরাধ মাফনীয় নহে।

কি শর্ম্মাশ্রো কি সাময়িক রাজ্যে সর্বত্রই
 প্রবৃত্তিকে উচ্ছৃঙ্খল ঘোটকের মত উন্মুক্ত ময়দানে
 ছাড়িয়া দিলে চলিবেনা। যখন বাহা থান চাহিবে;

তখনই তাহা করিলে দুর্বিপাক্তির মাগরে ডুবিতে হয় । দেশ কাল, পাত্র ভেদে পিতা মাতা ও গুরুজনের আজ্ঞা ও আপ্তবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া এই নানা-বিধ বিষয়সকল ঘূর্ণাবর্ত্তবিক্ষোভিত সংসারসমুদ্রবক্ষে প্রবৃত্তিতরগিকে ধীরে ২ চালাইতে হইবে । এ দুস্তর ভাবগবে তুফানের ভয় আছে, প্রবল ঝটিকার আশঙ্কা আছে, গুপ্ত পাহাড় পর্বতে ধাক্কা লাগিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে । সুতরাং সকল দিক্ সাম-লাইতে হইলে গুরু-কর্ণদ্বারের প্রয়োজন । স্বেচ্ছায় স্রোতে গা ভাসাইলে চলিবে না । স্বেচ্ছাচারী জীব কখনও তৃপ্তি পায় না । তাহার অতৃপ্ত দিন ২ বাড়িয়া উঠে ।

জীবপ্রকৃতির অভাব—আকাঙ্ক্ষা অনাদি অনন্ত । এ অনন্ত অভাবকে পরিপূরণ করিতে মান্ত পরিচ্ছিন্ন সাংসারিক বিকৃতিময় জগৎ সমর্থ হইবে কেন ? যে নিজে সীমানিশিষ্ট, সে অসীমকে আয়ত্ত করিতে পারিবে কেন ? সে নিজে ক্ষুদ্র, সে মহৎকে

আবরণ করিতে পারিবে কেন ? যাহার তৃষ্ণা বিশ্ব-
 ব্যাপিনী, ক্ষুদ্র জলাশয়ের স্থল মলিলে তাহার কি
 কুলাইয়া উঠে ? অগস্ত্য মূনির মত যাহার তৃষ্ণার
 বিরাট মূর্তি, তাহার জন্য অগাধ সাগরের অগীম জল-
 রাশি চাই, অনন্ত নির্ঝরির অফুরন্ত শীতল মলিন-
 ধারা চাই, যাহা চিরদিন প্রাণ ভরিয়া পান করিলেও
 ফুরাইবে না । অনন্ত মূলপ্রকৃতি আদ্যা শক্তিই ঐ
 শান্তিময়ী অমৃতনির্ঝরিনী । আঁঠু জীব ! ঐ হোম-
 মন্দাকিনীর তটদেশে একবার আগিয়া দাঁড়াও ।
 ত্রিভূগতপু দেহ যদি জুড়াইতে চাও, ঐ পতিতপাবনী
 পুণ্যমলিলা ভাগীরথীর ঘাটে নাগিয়া অবগাহন কর ।
 পিপাসু জীব ! কোন্ নির্ঝরিনী হইতে ঐ প্রেমপ্রবাহ
 বাহির হইয়া আসিয়াছে, তৃষ্ণার্ত তুমি, তোমার তাহা
 জানিবার প্রয়োজন কি ? ও ব্রহ্মতত্ত্ব রূপ ধারণার মূলতত্ত্ব
 নাই বুঝিলে ? তোমার আগার মত ক্ষুদ্র জীবের ও
 অনন্ত তত্ত্ব বুঝিয়া লাভ কি ? বুঝিবার সাধ্যই বা
 কোথায় ! তোমার পিপাসা জন্মিয়াছে । গঙ্গার উৎপত্তি-

হান নাও বুঝিলে, গজার যে দাঁটে নামিলে, তোমার
 হৃদয় মত জল সর্পিছেই পাইবে। আমাদের মত ক্ষুদ্র
 জীবের অশ্রু রূপ গোপ্পদ্যাত তাঁহার অনন্তমহার
 প্রবাহে নিমেষ মধ্যে পরিপূর্ণ চইয়া কোণায় ভাগিয়া
 যায়। বিচার বিতর্ক ছাড়িয়া দাও, বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানের
 অভিমান ডড়াইয়া দাও, মান অপমানের ভান দূর করিয়া
 দাও। এদিক ও দিক তাকাইও না, সংসারমেলার
 কোলাহলে কর্ণপাত করিও না, পাঁচ জনের কথায়
 নিজের কাঙ্ক্ষা হারাইও না, মানব দেহ পারণের শুভলক্ষ
 বুঝা নষ্ট করিও না,। মনের অনুরাগে অনুরাগে ভ্রমর
 আসনে মায়ের চরণাগ্রভাগের অমৃতময় স্রোতে
 গা ঢালিয়া দাও, তোমার ক্রিতাপজ্বালা মিটিয়া যাক।
 গেট খসটন ঘটন পটীগণী মহানারায়ণ অনন্ত শক্তি—
 অনন্ত সাহসাত্মক হৃদনায় আমার মত কীটপতীরের
 অস্তিত্ব নিন্দিত হুচ্ছ—নিতান্তই নগন্য। এতু পিতৃহুচ্ছ
 অভাবের জন্য তাঁহার দয়া ভিক্ষা করিতেও ভয়সা
 হয় না। যিনি রাজাপিতাজ, মণি মুক্তা হীরকা'দ যাঁহার

সতত সঙ্গে থাকে, তাঁহার কাছে দুইটি পয়সার ভিক্ষুক
 হইয়া তাঁহাকে বাক্স খুলিতে যে অনুরোধ করে, যে
 কি পাগল নহে ? সেই রূপ চতুর্দশ ফল যাহার
 পদকল্লতরুতলে কুড়াইয়া পাওয়া যায়, সেই রাজ-
 স্নাতকগণের মাথার কাছে আমার মত ক্ষুদ্র জীবের ক্ষুদ্র
 অভাব পূরণ জন্য দয়ার ভাণ্ডার খুলিতে অনুরোধ
 করা কি নিতান্তই অজ্ঞতা নহে। স্বর্গাঃ কোন্‌ মাহমে
 তাঁহার কাছে দয়ার প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইণ্ড ? কেহ ২
 তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিয়া থাকেন মা ! আমাদেরকে
 ভক্তি দাও ! আমি কিন্তু বৃদ্ধি, আমরা এ প্রার্থনারও
 অধিকারী নহি। দয়াগরী মা দয়া করিয়া যদি আমাদেরকে
 ভক্তি দিতেই আসেন, তাহা হইলে তাঁহার সে
 প্রদত্ত ভক্তি রাখিব কোথায় ? এ অপবিত্র জগতের
 নিষ্ঠারূপে যে সুদামারা ধরিব কেমন করিয়া ? এ
 কঠিন পাষাণে যে সুকোমল অমৃত বল্লরীকে রোপণ
 করিব কেমন করিয়া ? ভক্তহৃদয়ের মেনমন্দিরে
 নিহতকক্ষে যে কৌন্তভমণি অতি যতনে গোপনে

নক্ষিত হয়, তাহাকে আমার এই দম্যপরিবেষ্টিত
 হৃদয়াগারে রাখিব কোন্ তরসায় ? স্মরণাং তাঁহার
 কাছে চাহিব কি ? তাঁহার কাছে চাহিব মা ! আমার
 সম্মুখে একবার দাঁড়াও, এ অপবিত্র হৃদয় পবিত্র হইয়া
 যাউক ! এ অপরিষ্কৃত হৃদয়ক্ষেত্র পরিষ্কৃত করিয়া
 তোমার নিজের বসিবার উপযোগী করিয়া লও । এ
 বজ্রগম কঠোর হৃদয়ে কুসুমাস্তরণ বিছাউয়া লও ।
 মা ! ইচ্ছা হয়, তোমার দাস বলিয়া আপনাকে মনে
 করি, কিন্তু মনঃ প্রাণ তখন চমকিয়া বলে, নিধি বিষ্ণু
 শিব তাঁহার দাস, তাঁহার দাসত্ব করিতে চাও কোন
 সাহসে ! দেখি ! তোমাকে “ মা ” বলিতে বড় সাধ
 যায় । কিন্তু যখন ভাবি, তখন তাহাও বলিতে প্রাণ
 কাঁপিয়া উঠে । কান্তিকেন্নের মত জ্বলন্ত স্রোতঃসহাবীর
 ও সুরনর বন্দিত গুণাধিনায়ক বাঁহার পুত্র, আমার মত
 ভুল্ল জীব তাঁহাকে মা বলিতে পারে কোন্ সাহসে ।
 তোমাকে “ ভক্তবৎসল ” বলিয়াও ডাকিতে পারি
 না, কেননা আসি যে পরম অভক্ত । বলিতে পারি

তোমাকে “অনাথবৎসল” । কেননা আমার মত
 অনাথ দীন ভ্রাতৃগণ এ জগতে আর কেহ নাই । শান্ত্রে
 তোমার সহস্রমূর্তি ধারণের কথা শুনিতে পাই ।
 আমার ইন্দ্রিয় আগ উচ্ছ্বাল প্ররুতির নশীভূত হইয়া
 চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে । জনয়ের অন্তর্যামী
 দেবতা তুমি, একবার “জমীকেশ” মূর্তিতে অস্তুরে
 প্রবিভূত হও । ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে
 চারু চরণাভিমুখে চালিত কর । আমার উন্নত মন
 মাতঙ্গ উদ্দাম হইয়া নানা পথে দৌড়িতেছে । তুমি
 অকুণ্ঠ চিহ্নিত চরণস্পর্শে তাহাকে প্রশাসিত কর ।
 মা ! কোন ভাষায় তোমাকে ডাকিতে হয় তাহা
 জানি না, কি রূপ স্তম্ভিত ভাষায় ডাকিলে তুমি
 কাছে আসিয়া দর্শন দাও, তাহা বুঝি না । শুনিয়াছি,
 গজকলপের যখন যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন কাতর
 গজরাজের আর্তনাদে আহূত হইয়া তুমি শঙ্খ চক্র
 গদা পদ্মধারী বিষ্ণুরূপে দৌড়িয়া আসিয়াছিলে, গজের
 ভাষা তুমি শুনিতে পাও আর মনুষ্যের ভাষা শুনিতে

নাও না, উঠাত মনে হয় না। তাই বলি মা! সংসারের
 সকল কথা ফুরাইয়া দাও, সকল বৃত্তি উড়াইয়া দাও,
 সকল বাসনা পুড়াইয়া দাও, আমার সকল অভাব
 ভাসাইয়া দাও, এবুতি এবাহকে তোমার চরণ-
 রেণুতে মিশাইয়া দাও।

১ ভারতে উৎসব ।

কুণ্ডলা-হরিসভার উৎসবোৎসবক্ষে

(কুমার গ্রীষ্মকাল সময় পরিব্রাজক কৃষ্ণ বক্তৃতা)

ভূঃপৃষ্ঠে দুর্ভিক্ষপাতের নিদারুণ সজ্জাবাতে দেখে মনঃ
প্রাণ জীর্ণ ও বিশীর্ণ হইয়া বাইতেছে, যন্ত্রণার বিষম
নিষ্পেষনে অস্থির পঙ্কজ অগিয়া পাড়িতেছে, এমন
কুঃসময়েও ভূঃখী যদি স্রবের স্বপ্ন দেখিতে পায়, যোগ
অন্ধকারেও দীনভূঃখীর পর্ণকুটিরের ক্ষুদ্র আলোকের রেখা
যদি দেখা দেয়, তাহা হইলে সে স্বপ্ন অমূলক চড়ক, সে
ভুচ্ছ আলোক কণিক চড়ক, কণিক চড়ক, সে যুহুষ্ঠের
কন্যা সে স্রবের কণিকায় ভূঃখীর মনঃ প্রাণ মাচিরা
উঠে—নিষ্পেষের জন্য ভূঃখের তীব্রতা সে ভুলিয়া
যায়। যুহুষ্ঠের জন্য তাহার চিত্র আঁদার গুহ উজিয়া
হইয়া উঠে। আজ ভারতবর্ষের মতা ভূর্দ্ধিন বিষম দুর্ভিক্ষ-
পাতের সময়। এ ভূঃপৃষ্ঠে ভারতে উৎসবের কথা স্রবের

মত হইতে পারে, কিন্তু এ স্বপ্নেও স্বপ্ন আছে, শাস্তি আছে, এ ভীষণ নৈরাশ্যের সাগরে আশা ভরসার অভয়-কাহিনীর কণিকা সাত্রে শুনিলেও শ্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে । অনেকে বলিতে পারেন, আজি এ দুঃখের দিনে স্বপ্নের কথা কেন ? বর্তমান ভারতবর্ষ দুঃখসাগরে নিমগ্ন । কি রাজনীতি কি সমাজনীতি কি অর্থনীতি কি মর্শ্বনীতি সকল বিষয়েই ভারত হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে । ভারতের নিচিহ্ন প্রাসাদের চারিদিকেই ত অগ্নি লাগিয়া পুড়িয়া ছায় পায় হইতেছে, এমন দুঃখের দিনে ত সাথায় হাত দিয়া কাদিবারই কথা । এমন সময় উৎসব কেন ? এ অকাণ্ডতাও কেন ? যদি কোন নূতন সমৃদ্ধি লাভ হয়, নূতন শ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবেই ত উৎসব করিবার কথা । কিন্তু ভারত ত যে পরাদীন, সেই পরাদীনই আছে, যে দুঃখী, সেই দুঃখীই আছে, যে শূন্য, সেই শূন্যই আছে, তবে এ উৎসব কেন ? তবে এ নূতন জয়জয়মাট কেন ! যিনি এ কথা বলেন, তিনি ভারতের মর্শ্বকথা জানেন না ।

ছঃপের মধ্যে উৎসব কেন করিতে হয়, ভারতবর্ষ
 তাহা বুঝে । ভারতবর্ষ বুঝে, কাম্বার মধ্য হাঁসি,
 আঁপারের মধ্যে আলো, তাপের মধ্যে শীতলতা,
 শূণ্যতার মধ্যে পূর্ণতা চাই । একটি প্রাকৃতিক তৃপ্তির
 মধ্যে অগ্নি কণিকা পড়িলে তাহা যেমন পুড়িয়া যায়,
 সেই রূপ নিরানন্দতৃপ্তির মধ্যে আনন্দোৎসবের
 কণিকা পড়িলে তাহা উড়িয়া যায় । তাই এ বিসম
 ছঃপের দিনে উৎসবের স্বাভাবিকতা, তাই এ ছঃপী
 ভারতকে কণেকের মত সুখী করিবার জন্যে এ
 উৎসবগাথার সূচনা । উৎসব কঠিন পাশাণ ভেদ করিয়া
 তরল জলের উৎস উৎসারিত করিয়া দেয় ।

এখন উৎসবও একটু ব্যাখ্যা করিতে হইবে ।
 উৎসব ব্যাপারটি বুঝিতে হইবে । তুমুল আনন্দ রোল,
 তীব্র উৎসাহ, নানাবিধ সামগ্রীর আয়োজন, বিসম
 আমোদ আহ্লাদ আদি মিলাটয়া সে একটা ব্যাপার,
 তাহাকেই বলে উৎসব । স্তূলকণার আনন্দ প্রকাশের
 নামই উৎসব । আমরা বাহ্যিকের যে সমস্ত কার্য্য

ব্যাপ্ত হই, তৎসমস্তই ভিতরের বিকাশ । আমাদের
 ভিতরে যেক্রিয়া অকুরিত হয়—যে বৃষ্টি গড়াইয়া উঠে,
 বর্জিতগতে তাহা ফুটিয়া বাহির হয় । ইহা স্বাভাবিক
 নিয়ম । ভিতরে ফুল ফুটিলে বাহিরে শ্রগন্ধ আপনিই
 ছুটিতে থাকে । ভিতরে জলস্থ অগ্নি সঞ্চিত থাকিলে
 বাহিরে তাহার তাপ অনুভব হইয়া থাকে । ভিতরে
 হাঁস আসিলে বাহিরের অপরে তাহা প্রকাশিত হয়,
 প্রাণের ভিতরে সুখানুভব হইলে থাকিলে বাহিরে
 পুলকোদগমাদিরূপে তাহা ফুটিয়া উঠে । সুতরাং
 ভিতরে আনন্দ থাকিলে তবে ত বাহিরে আনন্দ-
 প্রকাশ রূপ উৎসব হইতে পারে ? কিন্তু আমাদের
 ভিতরে সুখ কৈ ? আমাদের সংসারনাশদহনবিদগ্ধ
 অশ্রুস্তল হইতে দুঃখের চিত্তাশ্রম অবিরতই উদ্‌গীরণ
 হইতেছে । স্থলদৃষ্টিতে আপাততঃ ইহা বোধ হয় নাট,
 কিন্তু আরও গভীর গর্ভে ডুবিয়া, আরও অভল ভলে
 তলাইয়া দেখ, সুখের শুদ্ধগর্তা নৃকিতে পানিয়ে,
 দেখিতে পাইবে, অন্তঃ সলিলা ফল্গুনদীর মত সুখের

নিষ্করিনী শীতল সলিল ধারায় প্রবাহিত হইয়া
 গাইতেছে। দেখিতে পাইবে, মনঃপ্রাণ বুদ্ধির অতীত
 স্থান হইতে কেমন সেই ঝরনার জল বহিয়া আসিতেছে।
 আমরা যখন জলের জন্ত কোন কূপ খনন করিতে
 প্রবৃত্ত হই, তখন খননের সময় প্রাণম দেখিতে পাই,
 বালুকা স্তূপ কেবল উঠিতে থাকে, পরে কেবল কর্দম-
 রাশিই দেখিতে পাই। কৈ পুথমেত জল দেখিতে
 পাই না ? কিন্তু তখনও আমরা নিরাশ চটনা। বালুকা
 কর্দম ভেদ করিয়া আরও তলাইয়া যখন খুঁড়িতে
 থাকি, দূর হইতেও দূরতম পুদেশ পর্য্যন্ত যখন উদ্ভাস
 করিয়া ফেলি, তখন বাঞ্ছিত জলধারা দেখিতে পাই।
 সেই রূপ শরীর মন আদি স্তর, অঙ্গগয় প্রাণময়াদি-
 কোম উদ্ভাস করিয়া যখন দেখিব, তখনই সেই তল-
 দেশে ত্রিভাপানল নিন্দাপন আনন্দেও শুণ্ড পুস্ত্রগবকে
 দেখিয়া চরিতার্থ হইতে পারিব। কূপখননের পুণম
 অবসরে দেখি কেবলই বিশুদ্ধ বালি। সেই রূপ শরীরাদি
 রূপ প্রাণম স্তর আসিয়া দেখি, কেবলই রূপ, বালুকার

জ্ঞান কেবলই নিশ্চক্ৰ ভাব। কূপখননের দ্বিতীয় অবসরে দেখি কর্দম, অর্থাৎ ময়লা মাটি মাখা কতটা জলীয় ভাগ। সেই রূপ মন আদি দ্বিতীয় স্তরে দেখিতে পাই দুঃখমাখা সুখ। যখন শেষ স্তরে ভেদ করিতে পারিব তখনই কৃপের নির্ম্মল জল ধারার জ্ঞান আত্মার অনবচ্ছিন্ন আনন্দ দ্বারা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিব। তাই বলিয়াছি, তলাইয়া দেখ ভিতরে আনন্দ বিদ্যমান রহিয়াছে।

তোমার একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে তুমি সুখী হও, আবার সেই প্রিয় পুত্রের অভাব হইলে তুমি দুঃখিত হও কেন? পুত্রের জন্ম হইবার পূর্বে তাহার সহিত ত তোমার জানা গুনা ছিলনা, কোন পরিচয়ইত ছিল না। তাহার সহিত কোন চিঠি পত্র লেখা লেগি ছিল না। সুতরাং পুত্র তোমার গৃহে আগন্তুক। আজ একজন আগন্তুক তোমার গৃহে যদি আসে, আবার চলিয়া যায়, তাহার জন্ম তুমি যেমন সুখী বা দুঃখী হওনা, সেই রূপ আগন্তুক পুত্রের জন্ম বা মরণে

তোমার সুখী বা দুঃখী হওয়া উচিত নহে । কিন্তু
 আশ্চর্য্য এই, আগন্তকের জন্মই সুখ দুঃখ হইয়া থাকে ।
 পুত্রের শরীরটিকে আমরা ঠিক ভাল বাসি না । পুত্রের
 শরীরটিকে ভাল বাসিলে তাহার পরিবর্তনে আমাদের
 দুঃখ হইত । বালক পুত্র যখন যুবা হয়, আবার যুবা
 পুত্র যখন বৃদ্ধ হয়, তখন যৌবনাবস্থায় বালক পুত্র
 মরিয়া যায়, বৃদ্ধাবস্থায় আবার যুবা পুত্রও ত মরিয়া
 যায়, কৈ তাহার জন্ম ত আমাদের দুঃখ হয় না ।
 স্তব্রাংশ শরীর রূপ পুত্র আমাদের ভালবাসার ধন
 নহে । আমরা পুত্রের তেমন জিনিষটিকেই ভাল বাসি,
 যাহার সহিত কখনও আমাদের পরিচয় নাই, জানা
 শুনা নাই, সেই অজানা অচেনা বস্তুর কি জানি কি
 কৃত্যকে আমরা আবদ্ধ, তাহাকে না ভাল বাসিয়া
 থাকিতে পারি না । পুত্রের শরীরটিকেই যদি ভাল
 বাসিতাম, তাহা হইলে পাঠশালায় গুরু মহাশয় লেখা
 পড়া শিখাইবার জন্য পুত্রের শরীরে আঘাত করিলে
 আমাদের দুঃখ হইত । কিন্তু তাহা ত হয় না । কেননা

তখন মন বাক্স রূপ পুত্রকে ভাল বাসি। পুত্র যদি লেখা
 পড়া না শেখে, বুদ্ধিটীন মূর্খ হয়, ত তেমন পুত্র বাঁচিয়া
 লাভ কি ? শুধু ২ জন শরীর ছাড়িয়া মন রূপ পুত্রের
 দিকেই ভালবাসার গতি হয়। কেননা তখন মনে হয়,
 শরীর রূপ পুত্র শুধু মহাশয় কর্তৃক নির্গোতিত হইলেও
 মন রূপ পুত্র ত ৩ পুটে প্রশিক্ষিত হইতেছে। ইহাতেই
 তখন আনন্দ হয়। আবার লেখা পড়া শিখিয়াও পুত্র
 যদি আদৃষ্টদোষে দর্শীতি পরায়ণ হইয়া দুষ্টে দুরাস্তা
 হইয়া উঠে, ত তেমন পুত্রকে আমরা চাহি না। তখন
 আস্তরূপ পুত্রকেই ভাল বাসি। দর্শীতি পাপাদি
 মলিনতায় সে আস্তা রূপ পুত্র কলুষিত হইলে মর্শ্বণেদনা
 উপস্থিত হয়। সুতরাং আমাদের ভালবাসার গতি
 বাহ্যস্তর ভেদ করিয়া দ্বীপে ২ কেন্দ্রাভিমুখী হইয়া
 অন্তঃস্তরের দিকেই ছুটিতে থাকে। একটা গুরুভার
 শিঙকে আকাশের দিকে উঠাইয়া দাও, দূর ২ নভো-
 মণ্ডল ভেদ করিয়া সে চলিয়া যাউক, সে যখনই উন্মুক্ত
 প্রান্তরে গিও কিন্তু থাকিতে পারিবে না। পৃথিবীর দিকে

পুনরায় তাহাকে প্রত্যাগতন করিতেই চাইবে। পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি যে তাহাকে টানিতেছে, সুতরাং তাহার পৃথিবীর সহিত ভালবাসাময়ী গতি নিম্নাভিমুখী না হইয়া থাকিতে পারে না। যের উচ্চতা হইতে নিম্নতার দিকেই ভালবাসা দৌড়িয়া থাকে। বাহির হইতে ভিতরের দিকেই ভালবাসা ছুটিয়া থাকে। সুতরাং ভালবাসার গতি অন্তর্ভেদিনী। তাই পুঙ্খের বাহিরের শরীরাদি রূপ স্তর ভেদ করিয়া ভালবাসা অন্তর চইতেও অন্তরতম প্রদেশে ডুবিতে চায়, উপরে না ভাসিয়া অনন্ত পেমামুদীর অতল তলে ভালবাসা ডুবিইতে চায়। ভালবাসা তাঁহারই পিয়তার মোগন্ধ পাইয়া আকৃষ্ট হয় যিনি অন্তঃস্থলে বাস করিতেছেন। যাহা প্রিয়, তাহা সুখময়। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, আত্মা আনন্দস্বরূপ।

সংসারের সুখ দুঃখ যাচা কিছু, সমগ্রই আঘাতে।
(এখানে মন বুদ্ধি রূপ আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই একপা
বলিতেছি, আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া নহে) সুখ দুঃখ

বাহিরের পদার্থের ধর্ম নহে, সমস্তই মনের অংশ মাত্র ।
 আজ মনের এই দুইটি অংশ মুছিয়া গেলে পুত্রের জন্ম
 মরণে আর সুখ দুঃখ অনুভব হইতে পারে না । যদি
 সুখ দুঃখ বাহিরের পদার্থের ধর্ম হইত, তাহা হইলে
 একই পদার্থ এক সময়ে সুখময়, অন্য সময়ে দুঃখময়
 হয় কেন ? যখন মানব সংসারী গৃহস্থ থাকে তখন
 ভোগ্য বিলাসময় পদার্থে কত সুখ বোধ করে,
 আবার যখন বিরাগী সন্ন্যাসী হয়, তখন সেই সমস্ত
 পদার্থই দুঃখময় অনুভব করিয়া তাগ করে । এক
 সময়ে তাহাতে আনন্দ হইত, অন্য সময়ে তাহাতে
 বিতৃষ্ণা জন্মিল কেন ? এক সময়ে সে অগ্নি তাপ দেয়,
 অন্য সময়ে তাহাতে কি শীতলতা পাওয়া যায় ? তাপ
 নাকি অগ্নির ধর্ম, তাই অগ্নি দিরদিনই তাপময়, সুখ
 বা দুঃখ সেই রূপ পদার্থের ধর্ম যদি হইত, তাহা
 হইলে একই বস্তু চির দিনই সুখময় বা দুঃখময় হইত ।
 কিন্তু তাহাত হয় না । সতরাং সুখ দুঃখ মনের অবস্থা
 মাত্র । যখন মানব সংসারী থাকে, তখন মনের যে

ভান, বৈরাগ্য অবস্থায় সে ভাব পবিত্রিত হইয়া যায়। সংসারী অবস্থায় মনের যে প্রীতিময় অংশ সংসারে চড়াইয়া দেয়, বৈরাগ্যাবস্থায় তাহা উঠাইয়া লইয়া থাকে। তাই সংসার জীর্ণ কঙ্কাল বলিয়া বোধ হয়।

সুতরাং স্বপ্ন ভ্রম, প্রীতি অপ্রীতি, অনুগাণ ও ঘেম মিত্রতা ও শত্রুতা সমস্তই মানবের মনে। চিরকাল যাহাকে শত্রু বলিয়া জানি, বিজয়া দশমীর পবিত্রে উৎসবে তাহাকেও প্রেমালিঙ্গন দিয়া থাকি। শত্রুতা যদি বাল্লিগত ধর্ম্য হইল, তাহা হইলে বিজয়া দশমীর দিনে “শত্রু” আবার “মিত্র” হইল কেমন করিয়া? আগার মনে যে শত্রুতা ছিল, তাহা নাকি বিজয়া দশমীর পবিত্রে শক্তিতে মুছিয়া গিয়াছে, তাই প্রেমভরে শত্রুকে মিত্র করিয়া লইলাগ। সুতরাং উৎসব শত্রুকে মিত্র করে, নিবিড় নিরানন্দে প্রসন্নতা আনিয়া দেয়। উৎসব ক্ষুদ্রকে মহান করে, অচেতনকে সচেতন করে, মলিনকে উজ্জ্বল করে, ক্ষীণকে তেজোয়ান করে, শূন্যকে পূর্ণ ও অভাবযুক্তকে প্রভাবযুক্ত করিয়া দেয়। উৎসবের শক্তি আশ্চর্য ও অনিবার্য।

স্তম্ভ দুঃখাদি সমস্তই জীবনের ভিতরে বিদ্যমান
 রচিয়াছে। বাহিরে স্তম্ভ সম্মেলন করিতে হইবে না।
 ভিতরে প্রচ্ছন্নরূপে যে স্তম্ভসমূহ বিদ্যমান, তাহাকে
 প্রকাশ করিতে পারিলে আর ভাবনা কি? বাহিরে
 স্তম্ভসম্মেলনের চেষ্টা বৃথা। ভিতর হইতে দুঃখমূল
 উৎপত্তি করিতে না পারিলে মনোরথ সিদ্ধ হইবে
 না। পবন কারুণিক ভগবান্ সমস্তই আমাদের অন্তরে
 নিহিত করিয়াছেন, আমাদের অন্তর্ভাগ্যের ভরণ করিয়া
 রাখিয়াছেন। কিসের জন্য আমরা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে
 হঠাৎ হঠাৎ? আমাদের নিজের সর্গাদানি জেনেই কাছে
 আছে। গণের জ্ঞানের লেভিতে যদি বসিবার
 অধিকার না পাও তাহা হইলে তোমার অসমর্থতা কি?
 তোমার যে হৃদয়-দরবারে অন্তর্যামী রাজরাজেশ্বর
 বাস করিতেছেন, সেটাই দরবারের দরবারী জীব তুমি,
 তোমার সর্গাদান ভাবনা কিসের? বাহিরের ব্যাপারে
 তোমরা দীন দৃষ্ট পাপপানত ঘৃণিত তুচ্ছজাতি, ততরাং
 এমন অসমর্থ উৎসব করিবার কথা নাই বটে, কিন্তু

ভিতরের দিকে তাকাইলে অখ্যাতিরাজোর দিকে
 তাকাইলে উৎসব সম্বন্ধে মানব আশা'স্থত হইতে
 পারে। বাহিরের সংসার চুঃখময় বটে, বাহিরের
 মণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃকরণ রাজ্যে প্রবেশ
 করিলে সেখানেও দেখিতে পাই, চুঃখ মিশ্রিত সুখের
 লীলা, কিন্তু তাহা অপেক্ষা আরও নিম্ন তলে নামিলে
 দেখিতে পাই, যিনি মনের মন, অন্তরের অন্তর, প্রাণের
 প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়, সেই অতীন্দ্রিয় দেবতা নিত্য
 সুখের লহরীলীলায় সদা ভাসমান। তাঁহারই সুখের
 প্রতিচ্ছায়া পাইয়া মনে সুখাভাস আসিয়াছে, সেই
 সুখদুর্য্যের কারণরাশির প্রতিবিন্দু মাত্র পাইয়া ও
 পাতিত দুঃখপূর্ণ জগৎ হাঁপির অনির্ব্যল শুভ্র মূর্তি দেখিতে
 পাইয়াছে। সুতরাং যদি উৎসব করিতে হয়, ত তাঁহাকে
 লটখা। ভারতবর্ষ তাঁহাকে ভুলিয়া কখনও উৎসব
 করে নাই। ভারতের প্রত্যেক উৎসব সেই আখ্যাতির
 সূত্রের তারে ২ গাঁথা। ভারতের ভিতর ভাগ মহোৎ-
 সবময়। মগো২ তাহারই ছায়া তাহারই সৌরভ বাহিরে

আমিমা মংসারকে স্মৃশীতন করিয়া থাকে । অন্য জীব তাঁহারাই, যাঁহারাই এই বিষ্ণু পাদোদ্ভবা মহোৎসব-মঙ্গায় অবগাহন করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন ।

৭. জড়বাদী জড় পদার্থ ছাড়া কোন আত্মশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না । তাঁহার মতটি এই খানে একটু সমালোচনা করিতে চাই । জড়বাদীও স্বীকার করিবেন, আমাদের সম্মুখে যে পদার্থরাশি রহিয়াছে, এই পদার্থের স্বরূপ আমাদের চক্ষুর গোচরীভূত হয় না, বস্তুকে আমরা দেখিতে পাই না । বস্তুকে অলস্মন করিয়া যে রূপ যে ব্যাপকতা, যে আকৃতি অণুয়ব, যে লম্বাই চোড়াই আদি গুণ গুলি থাকে তাহাকেই আমরা দেখিতে পাই । সুতরাং বস্তুর উপলব্ধি হয় না, বস্তুর গুণ বা শক্তির সহিতই কার্য্যক্ষেত্রে আমাদের দেখা শুনা আলাপ পরিচয় হইয়া থাকে । এই শক্তিকেই আমরা আদর করিয়া থাকি । পদার্থকে আদর করি না । পদার্থের সহিত আমাদের যাক্ষাৎ কোন প্রয়োজন নাই । তোমার স্বর হইয়াছে, কুইনাইন রূপ ঔষধকে

তুমি চাও কেননা জরস্রতা শক্তি তাহাতে আছে । আজ
 জরস্রতা শক্তি কুইনাইন হইতে যাদ নিলুপ্ত হয়, তাহা
 হইলে সে কুইনাইন তোমার পক্ষে আর আদরের সামগ্রী
 নহে । কুইনাইনের জরস্রতা শক্তিকেই তুমি ভাল
 গাম । ভ্রমমালায় ভ্রমম আমক দিনের পুরাতন হইলে
 তাহা ফেলিয়া দেয়া কেননা তাহার শক্তি চলিয়া যায় ।
 স্তব্ধতাং জগৎ শক্তিরই উপায়ক—শক্তিরই মৈত্রী ।
 শক্তি ছাড়া পদার্থ অপদার্থ—স্বাভাবিক মাত্র ।
 বাহিরের আকর্ষণ পরিচয় করিয়া এই ক্ষমতা শক্তির
 দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে । বাহিরের মহল ভেদ
 করিয়া, যে অন্তর মহলে আমাদের ভাল বায়ার মন
 নিদ্রামান রচিয়াছেন, যে অন্তরের অধিপতী দেবতা
 দিক্ আলো করিয়া নিরাক্ষর করিতেছেন তাঁহার চরণ
 তলে শরণ লইতে হইবে । সেই লোকালোকবাসিত
 চাকচর্য্য সুপাশিষ্ণু হইতে উচ্ছলিত হইয়া আনন্দপ্রবাহ
 জীবকে অশেষ ভ্রম হইতে নিস্তার করে । এই সুখ-
 মিকুর গন্ধু মাত্র স্পর্শে জীবন কল্যাণ হইয়া যায় ।

আমরা আশারকে চাই কেন, অপেক্ষা শক্তি আছে বলিয়া। ইক্ষুকে গিফট দাঁল কেন? ইক্ষুর “রস” গিফট বলিয়া। আমাদের শরীরাদি যেন ইক্ষুদণ্ড স্বরূপ, আর আত্মা ইহার রস স্বরূপ। তাই ত্রুটি বলিয়াছেন, “রসো বৈশঃ”। এই রসের আশ্বাদ যে দিন জীব করিতে পারিবে, সেই দিন তাহার চিরদিনের নীরস জীবন সরস হইয়া যাইবে। এই আনন্দের প্রাপ্তি হইতে যে দিন সুখসুখার উৎস নিঃসৃত হইয়া আসিবে সে দিন সে আনন্দধারায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আশ্রিত হইয়া উঠিবে। সংসারের সুখ আপাততঃ সুখ বলিয়া বোধ হয় নটে, কিন্তু পরিণামে তাহাতে ক্রোধই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাংসারিক সুখের উদয় কালে পূর্ব দঃখ স্মৃতি হয়। সুখের দিনে দঃখের কথা মনে পড়ে। ইহা স্বতঃ-সিদ্ধ কথা। দঃখের দঃখই স্মৃতি না হইলে সুখের সুখই অনুভবই হইতে পারে না। কেননা সুখ ক্রোধ পরস্পর যুগাপেক্ষী। সুতরাং যে সুখের উদয়ে ক্রোধ, পরিণামে দঃখ, কেবল ভোগকালে বিদ্যুত্তের ন্যায়

অসুভূত হইয়া যাহা অগমান হয়, তেমন সুখ সুখই নয়। যাহার ক্রিয়াতে সুখ, পরিণামে সুখ, ভোগ করিবার সময় যাহাতে সুখ, বরফ যেমন জলময়, সেই রূপ যাহা সুখময় সেই বস্তু পাতিবার জন্যই জীব লালায়িত। আধিক্যাত ধন্যকেই সেই সুখের আদর্শ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। যখন কোন ধন্যপরায়ণ পুরুষ একাদলীর উপবাস রূপ ধন্যকার্যের অনুষ্ঠান করেন, তখন বাহিরের লোকে হয় ত মনে করিতে পারে, উপবাসে তাঁহার কষ্ট হইতেছে। কিন্তু ধর্ম্মশ্রম পুরুষ তাহাতে কষ্ট অনুভব করেন না, তিনি ভাবেন, আজ কি তাঁহার পক্ষে শুভদিন, যে তিনি এই রূপ ধন্যকার্য করিবার অবসর পাইয়াছেন। এই সুমুগ্ধ চিন্তায় তাঁহার অন্তরাত্মা আনন্দিত হয়। দর্শনোৎসবের সময় ত্রিগাভ্রা যখন ব্রাহ্মণ ভোজন করান, তখন হয়ত সমস্ত দিনের মধ্যেও তাঁহার একটু কল গ্রহণ করিবার অবসর হয় না। ইহার দরুন তাঁহারা ত কিছু খাওয়া কষ্ট হয় না। বরং চারিদিকের ভোজন বাপানে

তঁাহার মনে এক অদ্ভুত পূর্ব আনন্দের সঞ্চার হয়, তিনি সে আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠেন। এই মে-একাদশী উপবাস ও ত্রাঙ্গণ ভোজন রূপ ক্রিয়া, এই ক্রিয়া করিবার সময় সুখ। আবার এই ক্রিয়ার পরিণামে সুখ, অর্থাৎ তাদৃশ ক্রিয়া জনিত পুণ্য দ্বারা স্বর্গাদিলাভ হয়, সেই স্বর্গসুখ ভোগ করিবার সময় সুখ, সুতরাং ইহা সুখময়। এ সুখের উপর সুখ দুঃখমাতা মলিন মনো-রাজ্যের কোন রূপ আধিপত্য নাই, ইহা আধ্যাত্মিক রাজ্যের নিজস্ব, তাই ইহা সুখময়। এই রূপ শ্রেণির সুখকেই হিন্দু সুখ বলিয়া বুঝেন, তাই তঁাহার চক্ষে পাখির সুখ উপেক্ষিত। হিন্দুর প্রত্যেক মন্য কন্য এই রূপ সুখময় কিন্তু গদুটদোমে বর্তমান মন্য কন্যাত্তান-প্রণালী দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। তাই মন্যকায়া করিবার সময় লোকে কষ্টই অনুভব করিয়া থাকে।

✧ পূনেনই বলিয়াছি, আত্মরূপ সুখসূত্রের কিরণ রাশির প্রতিবিম্ব মাত্র পাইয়াই মনোরাজ্যে সুখের অংশ আনিয়াছে। শ্রুতিও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

“ আনন্দময়ো হ্যগ্না, প্রকৃতিত্বং আনন্দত্বং ”

মাজিমুগজীবনঃ সৰ্ব্বো আনন্দাঃ ”

যাহার নকল পাইয়া এত সুখ, সেই আসল জিনিষটিকে পাইলে না জানি কত সুখ হয়; কিন্তু তাহার অশ্রু মায়াবিমুক্ত জীবের চেষ্টা হয় না । নিদারুণ জীত-কালে তুমি জীতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছ, ঙ্গাতঃকালে জীতে ধর ২ করিয়া কাঁপিতেছ, বিছানা হইতে উঠিতে ইচ্ছা হইতেছে না । বিছানাতে বসিয়াই তুমি যদি রোদ্র পোহাইতে পাও, তবে তোমার বড় আনন্দ হয়, রোদ্রে তোমার জীত নিম্ন হুড়তা কাটিতে পারে । এই আশ্চর্যক ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া তুমি জানালা খুলিয়া রাখিয়াছ, আশা আছে, জানালার ভিতর দিয়া সূর্যরশ্মি আসিয়া তোমার গায়ে পড়িবে, তোমার জীতান্ত জড় দেহকে কম্বাট করিয়া তুলিবে । কিন্তু যদি সূর্যরশ্মির সমসুত্রপাতে জানালা খোলা থাকে তবে ত রশ্মিরাশি জানালার ভিতরে প্রবেশ করিবে । সূর্যরশ্মি আসিতেছে এক দিকে, আর জানালা

খেলা থাকে যদি অন্যদিকে, তবে তুমি রোজ উপভোগ
 করিলে কেমন করিয়া ? এখন এই দৃষ্টান্তের সাহিত্য
 কথাটা মিলাইয়া দেখ । সংসারের নিদারুণ শীতে
 আমরা সদাই আর্ত—পীড়িত—জড় । ইচ্ছা যায়, ঘরে
 বসিয়া সুখ্যগোর রোজ পোহাইতে । তাই শরীর রূপ
 গৃহে মন রূপ জানালা খুলিয়া রাখি । যিনি সুখবুঝ
 ক্ষোভাতিগুণলগ্ন, তাঁহা ভটেতেও কিরণ মালা অনিরত
 চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া থাকে, তবে সে সূর্য্যরশ্মি
 অশুভল করিতে পাই না কেন ? যে হেতু মনরূপ
 গলাফারকে তাঁহার সমসূত্রপাতে (মুখে মুখি)
 করিয়া খুলিয়া রাখিতে জানিনা । তাঁহার কিরণের
 প্রবাহ আগে এক দিকে, আমাদের জানালা খেলা
 থাকে অন্যদিকে অর্থাৎ সংসারের দিকে । তাই সে
 কিরণ স্বরূপতঃ উপভোগ করিতে পাই না । তাহার
 একটা আবছায়া পাই মাত্র । সে কিরণ প্রাপ্ত হইলে
 সমস্ত জড়তা মটিয়া যায়, যে বৈদ্যাতিক শক্তি উদ্দীপিত
 হইলে সংসারবিষমুচ্ছিত অচেতন মনঃ প্রাণ সচেতন

হইয়া উঠে, দুর্ভাগা জীব! সোদকে একবার তাকাইলে
না। কেনন তাহার প্রতিচ্ছায়া লইয়া তুমি মজিতে
চাও, আসল ফেলিয়া নকলে ডুবিতে চাও, গোণা
ফেলিয়া গিলটিতে মোহিত হইতে চাও, রূপা ফেলিয়া
রাং লইয়া নৃত্য করিতে চাও, তাহাতে প্রকৃত সুখ
পাইবে কেন ? চন্দ্রশ্রম পাগলিনী কুমুদিনী তাঁদের
কাছেই সুনার ভিখারিনী হইয়া থাকে, তাহারই দিকে
মহত্ব দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে। তাঁদের মে প্রতিবন্ধ
জ্বলেতে পড়ে, তাহার কাছে সে পার্থক্য বেশে দাঁড়ায়
না, সেউ রূপ সুখসুখা যদি চাহিতে হয়, তবে জীব !
তোমার অন্তঃগনতল যে মোহন চন্দ্রমার মৃদু মধুর
দিবালকটায় উল্ভাসিত হইতেছে একবার তাহার দিকে
তাকাও ! সেউ পূর্ণেন্দুর নিমল মাধুরীর দারায় যে দিন
অবগাহন করিতে পারিলে, সে দিন আর তোমার
ভাবনা কিদের ? সে আশাশ্রিত জগতের প্রতিচ্ছবি এ
বর্জিতগতে সুপের আশা করিও না।

পূর্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে, চুঃখী জীবকে শুখী

করিবার জন্যই উৎসবের আয়োজন। জীবিত সম্বন্ধেই
 দুঃখে নিমগ্ন, কেননা দুঃখের ভাগই জগতে বেশী ।
 এই দুঃখের তীব্রতা লাঘব করিবার জন্যই মনো
 উৎসব প্রয়োজন। পূজা শব্দ লইয়াই হিন্দুর উৎসব ।
 অশ্বিনার্য দেশের উৎসব কেবল পার্থিব সম্পত্তি লইয়া,
 বিলাস বিভবের সামগ্রী লইয়া। কিন্তু হিন্দুর উৎসব
 তাঁহাকে লইয়া। উৎসবে এমন ব্যাপার সমূহ অনুষ্ঠিত
 হয় বাহ্যে অসম্মত মনেও প্রসন্নতা আসে । হিন্দুর
 পূজার সময়ে যখন শঙ্খবটা বাজিয়া উঠে, ধূপের
 সৌগন্ধ ছুটিয়া উঠে, আরতির দীপমালা জ্বলিয়া উঠে,
 তখন বিষম মনেও প্রীতির সঞ্চার হয় । দয়ালু আশা
 ঋষি দুঃখী জীবের প্রাণত তাকাইয়াই অস্ত্রজগতের
 আধ্যাত্মিক ছায়া লইয়াই উৎসবের ব্যবস্থা করিয়া
 গিয়াছেন। তিনি যে আনন্দমাগরে ডুবিয়াছিলেন, যে
 রসমাগরে আত্মহারা হইয়াছিলেন, জীবকে সেই
 সুখে স্থখী করিবার জন্যই উৎসবরূপ আনন্দময়
 সপাত্রতের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে শুণ্ড

ভাগ্য-লাগু হইতে সুদাপানে বিভোর হইয়াছিলেন, যে অধ্যাত্মমাগের মহোৎসবে মাতিয়াছিলেন, কেবল একাকীই তাকা তিনি উপভোগ করেন নাট, দীন জগতের জন্য সেই গুপ্ত গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন। কেননা তিন সে দয়ালু। জানি তোমার বিপুল সম্পত্তি আছে। কিন্তু তোমার সে বিপুল সম্পত্তির কণিকা মাত্রও যদি আমার মত দীন দুঃখীর উপকারে না আসে, তবে তুমি আমার কাছে ধনী কিসের? অথচ স্বপ্নে যে সাধের ধন পাইয়াছিলেন তাহা জগতে বিলাইয়া গিয়াছেন, কেননা অতুল দয়া তাঁহার, তাই এ দুঃখীদের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল। তাঁহার দয়া না হইলে কলিকুলুদূষিত আমাদের ন্যায় মায়ামুগ্ধ জীবের গতি হইত না।

✓ স্বয়ং ক্রিয়া করিলে যেমন একটা ফল পাওয়া যায়, অনেক সময় স্বয়ং ক্রিয়া না করিলেও সেই ফল দেখিলে ভিতরে তদনুরূপ ক্রিয়া হয়। একটা দৃষ্টান্ত দেখ, তোমার ভিতরে দুঃখের ক্রিয়া হইলে বাহিরে তাহার

ফল কামা রূপে প্রকাশিত হয়, ইহা যেমন দেখা যায়, সেই রূপ ইহাও দেখা যায়, তোমার ভিতরে দুঃখের ক্রিয়া না হইলেও অপরের কামা দেখিলে অপরের মলিন মুখে অশ্রুধারা বাহতে দেখিলে তোমারও দুঃখের উদ্ভেদ হয়, তোমারও মুখে কামা আসে । তুমি হয় ত বেশ আনন্দে আছ, কিন্তু তুমি সেই অনহাতেই যদি এমন একটা দুঃখের মণ্ডলীর মধ্যে গিয়া পড়, যেখানে দুঃখের আভিনাদ ছাড়া আর কোন কথা নাই, কামা ছাড়া আর কোন ব্যাপার নাই, তেমন স্থানে তুমিও নিজে না কাঁদিয়া থাকিতে পার না । এই রূপ কোন স্থানের ইঙ্গিত ছল্লাড়ের মধ্যে পড়িলেও তুমি দুঃখী হইলেও না ইঙ্গিতা থাকিতে পারিবে না । সুতরাং অপরের ক্রিয়ার ফল দেখিয়া তোমারও ভিতরে ক্রিয়া হয় । যে উৎসবে দশজনে মিলিয়া আনন্দ করে, সেই আনন্দমণ্ডলীর মধ্যে পড়িলে তুমি অসদুঃখী হও না কেন, সে মুহূর্তের জন্য তুমি আনন্দাংশের ভাগী না হইয়া থাকিতে

পার না, সুতরাং উৎসব নিরানন্দে সহিত সংগ্রাম
 করিয়া তাহাকে পরাজিত করে । উৎসবের তেজে
 নিরানন্দ দূরে চলিয়া যায় । অতএব এ দুঃখপূর্ণ
 সংসারে উৎসব চাই । যদি উৎসব না থাকিত, তাহা
 হইলে এ সংসার মরুভূমি হইত । উৎসবই সংসারকে
 বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, উৎসবই জগৎকে স্থিতিশীল
 করিয়া রাখিয়াছে । উৎসব না থাকিলে দুঃখযজ্ঞের
 অনিরত পিষ্টপেষণে সংসার ভস্মীভূত হইয়া, কোথায়
 উড়িয়া যাইত । উৎসব শ্রমানে জীবনী শক্তির বিকাশ
 করে । মরুভূমে অমৃতের নদী প্রবাহিত করে । পামাণে
 অমৃত বল্লরীকে অকুরিত করে । তাই উৎসব জীবের পক্ষে
 বড় প্রিয় পদার্থ । হিন্দু উৎসবের শক্তি বুঝিতে, তাই
 ষোড়শ মাসে ষোড়শ পর্বোৎসবের বিধান করিয়াছেন ।
 হিন্দুর উৎসবের দুইটি পৃষ্ঠ আছে, একটি বাহিরের,
 অপরটি ভিতরের । বাহিরের দিক্ দিয়া দেখিলে বোধ
 হয়, আশোদ আহ্লাদ করিবার জন্য ইহা এক ব্যাপার
 মাত্র । ভিতরের দিক্ দিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি ইহা

কেবল সামান্যর স্তর। প্রকৃত সুশিক্ষক যেমন টিয়া পাখির মত পুঁথির বুলি অভ্যাস না করাইয়া প্রাকৃতিক পদার্থ পুষ্প হইতেই শিশুকে শিক্ষিত করিয়া তুলেন, সেই রূপ আর্গ্য খামি এই প্রাকৃতিক উৎসবের ভিতর দিয়া জীব-শিশুকে গভীর সামান্যর তত্ত্বকথার ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুতরাং হিন্দুর উৎসব কেবলই কাল্পনিক নহে। ছেলে খেলা নহে, কিন্তু প্রকৃতির নিয়মেরথায় নিজড়িত। অগাধ সামান্যর তত্ত্ব ইহার ভিতর অনন্তুষ্ঠিত। উৎসবতত্ত্বের স্তর উদ্ঘাটন করিয়া আমরা তাহা ক্রমে ২ দেখাইতেছি।

নৈশাখের নিদারুণ গ্রীষ্মে যখন সকলেই পীড়িত হইয়া উঠে, সূর্য্যদেব অগ্নির ফোয়ারার মত যখন প্রচণ্ড রৌদ্র বর্ষণ করিতে থাকেন, তখন সে তাপশক্তির তীব্রতায় শীতলতা শক্তি নিতান্ত অভূত হইয়া যায়, জীব নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এই বিসম সম্ভাপনয় সময়ে হিন্দু ত্রিতাপতারিণী গঙ্গাদেবীর আরাধনা করেন। শীতকালে গঙ্গাপূজার বিধি নাই, কেননা তখন প্রয়োজন নাই। পতিতোদ্ধারিণী মা গঙ্গা শীতলতার

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাই নিদাঘের ভীষণ তাপে হিম্মু
 তাঁহার চরণ তলে শরণ লয়। গঙ্গাপূজার পর জগন্নাথের
 স্নানযাত্রা। [জ্ঞান] গঙ্গার পূত বারিতে জগন্নাথ দেব
 [আত্মা] বিদ্যোত হইয়া মলিনতাবর্জিত হইয়া যখন
 স্বচ্ছ হইয়া উঠেন, তখনই তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়,
 তাই স্নানযাত্রার উৎসব। জ্ঞানের নির্মল জ্যোতিতে
 অজ্ঞানানুকার বিদূরিত হইলে আত্মসাক্ষ্যকার হয়
 তাই স্নানযাত্রার পর গণযাত্রা। শরীর রূপ রূথে জগন্নাথ
 রূপ আত্মার দর্শন হইলে পুনর্জন্ম থাকে না। (রণস্থং
 বাগনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে) কেবল তাঁহাকে দর্শন
 করিলে তৃপ্তি হয় না। আদরের সাগরীকে নিজস্ব
 করিতে না পাইলে প্রাণ পুঙ্খিত হয় না। তাই সাধক
 যা যশোদার ন্যায় জন্মান্তরীণ দিনে তাঁহাকে পুত্ররূপে
 প্রাপ্ত হইয়া কোলে করিয়া মোহাগ করিবার অশকাশ
 পান। অঞ্চলের নিধি সাধের মনকে বুকে রাখিয়া তাপিত
 জীবন শীতল করেন। শরতের শারদীয়া যুতিতেই
 সাধক তাঁহার সাধের দেবতার পূর্ণ বিকাশ

দেখিয়া থাকেন। ত্রিভুবনের রাজরাজেশ্বরী মা তখন
 ত্রিজগতের মা হইয়া অপরূপ রূপ লাভণ্য লহরীর
 ভরঙ্গ লীলায় দিগন্ত প্রান্তর উদ্ভাসিত করিয়া ব্যাপক
 রূপে আবির্ভূত হন। তাঁহার সে পূর্ণ যুতি দেখিবার
 জন্য প্রকৃতি নবনগর বেশে সজ্জিত হইয়া উঠেন।
 বর্ষার বারিধারায় স্নাত হইয়া পবিত্র ভাবে তাঁহাকে
 দেখিবার জন্য প্রকৃতি যেন উদ্গীর্ণ হইয়া উঠেন। তাঁহার
 প্রকাশে শারদীয় নিশ্চল আকাশ উজ্জ্বল চন্দ্র তারকার
 স্তম্ভজিত হয়; ননের তরু মনের মত সুচারু সুরভি কুসুম
 দামে তাঁহার পূজা করে। শিশির বিন্দু রাশি মণি যুক্তার
 নাগ কৃৎসন্যাময় ভূতল উজ্জ্বল করিয়া দেয়। মা'কে
 দেখিবার জন্য যেন ত্রিলোক হাঁসিতে ভাসিতে থাকে।

সামান্য মহিমাস্বরকে বধ করিবার জন্য মহি-
 মর্দ্দিনী মায়েব এত আড়ম্বর কেন ? অভিমান রূপ
 অসুর অতিভয়কর। ঘোর সমাগিকালেও অভিমান
 সিন্ধু হয় না। তখন সাধুগণ এ অভিমান কোথা
 হইতে আসিয়া জুটে। ইহাকে সমূলে উৎপাটিত করিবার

জন্যই মহাশক্তির এ আড়ম্বর। রাবণ রূপ অহঙ্কারকে
 বিনষ্ট করিবার জন্যই রামচন্দ্র এই শক্তির আরাধনা
 করিয়াছিলেন। সহস্র কমলে তাঁহার চরণ কমল পূজা
 করিয়া ছিলেন। সুবুদ্বা মার্গে কুল কুণ্ডলিনীকে উত্তোলন
 করিয়া সাধক সহস্রারবিন্দে তাঁহাকে উপাসনা করিয়া
 ছিলেন। ভারতে যদি এ উৎসব না আগিত তাহা হইলে
 এমন গণিত ভাষায় আনন্দোন্মাদার সম্পত্তি হইতে
 সমাজ চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইত। ভারতের পরম
 মৌভাগ্য যে এই রূপ উৎসবের মুগ দেখিতে পাইয়াছে।
 অমাবাস্তার ঘোর অন্ধকারে জীব যখন অন্ধীভূত, নিদ্রার
 গভীর সাগরে জীব যখন নিমগ্ন, তখন প্রস্তুত জীবকে
 জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ করিবার জন্যই ভক্তজনপালিকা করাল
 কালিকা মুণ্ডমালিকা মূর্তির আবির্ভাব। ভারতের ঘোর
 অন্ধতমসচ্ছন্ন ছুদ্দিনে নীরব শ্মশানক্ষেত্রে হতচেতন
 ভারতকে ভীম তৈত্তর্য নির্যোমে জাগ্রত করিবার জন্যই
 রণরঙ্গে নৃত্যশালী নাচিয়া থাকেন। শ্যামা ছুটে অভক্ত-
 গণের পক্ষেই ভীমা, কালী অস্তর গণের পক্ষেই বিকরাল-

নদনা, কিন্তু ভক্ত গণের পক্ষে অভয়দায়িনী । সিংহী
 অপরের কাছে বিভীষণ হিংস্র জন্তু হইতে পারে, কিন্তু
 নিজের শিশুর পক্ষে সে মা, সেই রূপ শ্যামা নিজ ভক্ত
 শিশুর পক্ষে স্নেহময়ী জননী । নৃসিংহমূর্তি দুষ্ট হিরণ্য
 কশিপুর পক্ষে করাল কৃতান্ত, কিন্তু ভক্ত শ্রদ্ধাীদের কাছে
 তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু—স্নেহের অনন্ত প্রস্রবণ । শ্যামা
 আবার হাঁসিতে ২ শাস্তিময়ী জগদ্ধাত্রী মূর্তিতে দেখা
 দেন । এবুদ্ধ জীবকে আনন্দিত করিবার জন্যই সংহারিনী
 মূর্তির পরা তাঁহার এ জগদ্ধাত্রী অর্থাৎ জগদ্ধারিণী
 মূর্তি । অনন্তর দুন্দুভের বন বিধান জন্য জিতেন্দ্রিয়
 কাত্তিকেয় মূর্তিতে তিনি আবির্ভূত হন । তার পর
 রাসলীলা । এখানে ভক্তি প্রেমাকারে পরিণত হইয়া
 সাধকে সাধিকা সাজাইয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত
 করিয়া দেন । অনাদ্যা প্রকৃতি চৈতন্যের সহিত অতিম
 ভাবে মিলিয়া যায় । আরাধিকা সাধিকা রাস রমিক
 রসেশ্বরের বসময় তরঙ্গেরা ভাসাইয়া দেন । এই মিলনের
 পর আনন্দলহরী প্রাপ্ত হওয়া চাই, প্রেমের পর চোখানন্দ

উপভোগ করা চাই তাই রাসলীলার পর বীণাদিনী বাগ্‌না দিনী আসিয়া বসন্ত ঋতুর উদ্‌বোধন করিয়া দেন। ভরা বসন্তের মলয় মরুত হিল্লোলে প্রেমোল্লাসের ভাব যখন জাগ্রত হইয়া উঠে, সেই সময়েই দোলযাত্রার ব্যবস্থা। রাসলীলায় কেবল মিলনের ব্যাপার, দোল-যাত্রায় কেবল মিলনানন্দ উপভোগের ব্যাপার। তাই আবিরের ছড়াছড়ি, আনন্দের অহুল কল্লোল। ইহাই সাধনার চরমাবস্থা। এই কোমল ভক্তি যোগে যাহার কিছু হয় না, মলিনতা বিমুক্ততায় হৃদয় যাহার আচ্ছন্ন, তাহারই পক্ষে হঠযোগাদির কঠোর বিধি বাহিত হইয়াছে। তাই সর্বশেষে চড়ক পূজার ব্যবস্থা। নাক ফোঁড়া পিঠ ফোঁড়া, জলে ডুবিয়া থাকা আদি ব্যাপার এই পূজার অঙ্গ। এ সমস্ত হঠ যোগের প্রক্রিয়া মাত্র। ক্রমক্রমে বুঝিলাম ভারতের সমস্ত উৎসবই আধ্যাত্মিক সূত্রে গাঁথা। এখন অনেকে বলিতে পারেন এতগুলি উৎসব থাকিতে আবার এ হারিসভার উৎসব কেন? এ নূতন উৎসবের সৃষ্টি হইল কেন? একবার উত্তর আমরা দিতে চাই।

পূর্বে যে সমস্ত উৎসব উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে
 গান চাই, নোগ চাই, পূজা পাঠ চাই, নিয়মমত কর্ম-
 কাণ্ডের অনুর্তান চাই। সুতরাং তাহাতে শক্তি সামর্থ্যের
 প্রয়োজন। আমরা কলিযুগের নিতান্ত মন্দ অধিকারী
 শক্তিহীন জীব, আমাদের পক্ষে এমন উৎসব চাই, যাহা
 শক্তিহীন হইয়াও করিতে পারি। তাই এ নামের
 উৎসব আমাদের পক্ষে উপযুক্ত উৎসব। আমি কর্ম
 কাণ্ডত্যাগ করিতে বলিতেছি না, আমার বলিবার
 অভিপ্রায় এই যে আমাদের মত দুর্বল অধিকারীর পক্ষে
 এই নামোৎসবই মহাজসিদ্ধ সাধনা, কেননা ইহাতে শক্তি
 ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে না। আমরা দীন দুঃখী পথের
 কান্দাল, অর্থ ব্যয় করিয়া উৎসব করিতে পারিব
 না। যে উৎসব নিঃস্বল হইয়াও করিতে পারে,
 আমরা তাহাই চাই। আমাদের মত দীন দুঃখীরা প্রতি
 রূপা করিয়াই মহাপুরুষগণ এই নামোৎসবের ব্যবস্থা
 করিয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ যে নামগাথা গান করি-
 বার জন্য লাল্যিত, সেই নাম কীর্তন করিবার অশকাশ

পাইয়াছি, স্তব্রাং আমরা ধন্য । যোগীন্দ্র পুরাণ যে নাম
 স্মৃণা পান করিতে ২ মহামোগনিদ্রায় স্তম্ভিত হইয়া যান,
 সেই নামের উৎসবে মাতিতে পারিয়াছি, ইহা আমাদের
 পক্ষে পরম মৌভাগ্যের কথা । পাতক মহাপাতকাদি
 যে ভগবানের নাম উচ্চারণ যাজ্ঞেই নিদূরিত হয়, সেই
 করুণানিধান ভগবানের গুণবাদ শুনিবার জন্য তাঁহার
 মহিমা কথন জন্য তাঁহার ভাবে তাঁহার নামে মাতিবার জন্য
 তাঁহার প্রেমে নিভোর হইয়া তাঁহাকে মনঃ প্রাণে ধারণা
 করিবার জন্য যত্নে এই মহোৎসবের আয়োজন । তাঁহার
 নাম প্রেমভরে উচ্চারিত হইলে স্বর্গ মর্ত্য রসাতল সন্নিভল
 হয় । আজ আসুন সকলে জন্ম জীবন সকল করিবার
 জন্য প্রাণ ভরিয়া বলি, হরি, হরি বোল । যেন সকল
 কার্যের প্রারম্ভে মাথো ও অনঙ্গানে বলিতে পারি হরি
 হরি বোল । যেন ভিতরে বাহিরে তাঁহারই সন্তা অনুভব
 করিয়া কায় মনোবাক্য বলিতে পারি হরি হরি বোল ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

নিজ নিকেতন যাত্রা ।

দুঃখী হইতে দীন পর্য্যন্ত ভিখারী হইতে সম্রাট পর্য্যন্ত
জগতের সকলেই ইচ্ছার দাস—কল্পনার দাস । দীন
দরিদ্র যেমন নিজ ২ কল্পনার বিচিত্র চিত্রের মৌন্দর্য্যে
বিমুগ্ধ, মহারাজ চক্রবর্তীও সেই রূপ বিমুগ্ধ । উচ্চ
আশা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, প্রিয়তম বস্তু পাইবার পিপাসা
জগতের সকলেরই সমান । এ অংশে কাহারও সহিত
কোন তারতম্য নাই, তারতম্য কেবল সামর্থ্য লইয়া
অধিকার লইয়া । ফুটন্ত ফুলের রাশ তোমার উদ্যানে
শোভায় উৎলিয়া উঠিতেছে । ফুলের মনোমুগ্ধকরী
মাধুরীর ধারায় দীন পাখকের চিত্ত যেমন বিমুগ্ধ হয়,
ফুল লইবার জন্য তাহার প্রাণে বাসনা যেমন জাগিয়া
উঠে, তুমি বাগানের মালিক, তোমারও ফুল লইবার
জন্য তেমনই সাধ যায় । কিন্তু তারতম্য এই, তোমার
সাধ পূরণের উপায় আছে, কেননা বাগান তোমার

নিজের অধিকৃত । দীন পথিকের সে সম্ভাবনা নাই, তাহার মনের আশা মনেই বিলীন হয়, অন্তরের পিপাসা অন্তস্তলেই ডুবিয়া যায় । ধনীর বিলাসভোগে ধনীরই এক চেটিয়া অধিকার । নির্ধনের সে দিকে পদক্ষেপ করিবার যো নাই । তাই ধনীর অধিকারে পথের ভিখারী যদি বসিতে যায়, তাহা হইলে ধনী তাঁহাকে তাড়াইয়া দিতে চাভেন । একটা গল্প মনে হইতেছে । একজন পণিক সম্রাসী দেশ পর্যাটন করিতে ২ উপ-বনে গিয়া উপস্থিত হইলেন । তাঁহার শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে । বনের চারিদিক ঘুরিয়া তিনি আশ্রয় স্থল খুঁজিতে লাগিলেন, খুঁজিতে ১ এক প্রকাণ্ড মনোহর অট্টালিকা তিনি দেখিতে পাঠিলেন । সেই অট্টালিকাটি একজন নবাবের বিলাসমন্দির । অট্টালিকার আর দেশে গিয়া সম্রাসী দেখিলেন, সম্মুখে প্রকাণ্ড সভাসমুপে এক সুসজ্জিত রত্নখচিত সিংহাসন রহিয়াছে । সিংহাসন শূন্য, কেহই তাহাতে বসিয়া নাই । সিংহাসনের চারিদিকে বসিয়া পারিষদবর্গ যেন কাহার অপেক্ষা

করিতেছে। সম্মাগী আর কাল বিলম্ব করিলেন না, কাহকেও কিছু না বলিয়া একবারে সবেগে গিয়া সিংহাসনে বসিয়া পড়িলেন। সভাস্থ পারিষদগণ অশব্দ! এমন সময় নবাব আসিয়া পৌঁছিলেন। নবাব ফকীরের কাণ্ড দেখিয়া বলিলেন, এ আসন আপনার বসিবার জন্য নয়। ইহা রাজ সিংহাসন, আমারই জন্য। ফকীর বলিলেন ইহা তোমার আসন কে বলিল ? এ স্থান পাহুশালা, এ আসন পণ্ডিকের বিশ্রাম করিবার জন্য। ইহা যে তোমারই আসন এ বিষয়ে প্রমাণ কি ? রাজা বলিলেন আমার পিতৃ পিতামহ গণ এ আসন অধিকার করিয়া আসিতেছেন, আমিও বাল্যকাল হইতে ইহা অধিকার করিয়া আসিতেছি। সুতরাং ইহা আমার নৈক। ফকীর বলিলেন, সেই জন্যই তো বলিতেছি, এ আসন পণ্ডিকের। তোমার পিতৃ পিতামহ গণ এ আসন কয়েক বৎসর অধিকার করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, ভূমিও না হয় আরও বিশ বৎসর ইহা অধিকার করিয়া কোথায় চলিয়া যাইবে। আমিও সেই রূপ ইহা

দুচার ঘণ্টা অধিকার করিয়া চলিয়া যাইব। দুদশ বৎসর অধিকারের জন্য ইহা এত দিন “ তোমার ” হইতে পারে, আর দুচার ঘণ্টা অধিকারের নিমিত্ত ইহা এতক্ষণের জন্য “ আমার ” হইবে না কেন? তুমিও পণিক, আমিও পণিক। নবাব নিরুত্তর। ফকীর আরও বলিলেন, তোমার পিতৃ পিতামহ গণ ঠেহাতে কিছু দিন কাটাইয়াছেন, তুমিও না হয় কিছু দিন কাটাইবে, আমিও সেই রূপ না হয় কিছু ক্ষণ কাটাইয়া লইলাম। তুমি, আমি চলিয়া গেলে আবার কেহ আসিয়া এ পাছশালায় কিছু দিন কাটাইবে। সুতরাং ইহাকে তুমি এক বারেই “ আমার ” বলিয়া বুঝিয়াছ কেন? তাহাই প্রকৃত “ আমার ”, যাহাকে কখনও ছাড়িতে হইবে না, যাহার সহিত কখনও বিচ্ছেদ হইবে না। তেমন বস্তুই অন্বেষণ করা উচিত। ফকীরের ভাষায় আমরাও তাহাই বলিতে চাই। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত পথের পণিক আমরা এ নিদারুণ সংসার গহন কান্ডারে আগন্তুক। আমাদের ঘর বাড়ি সমস্তই পাছশালা। দুদশ

দিনের জন্য এ পান্থশালায় বিশ্রাম পূর্বক সম্বন্ধীয়
 সাধন করিয়া নিজ নিকেতনে যাইবার জন্য সম্বল বা
 সাধন লইতে হইবে। এ পান্থশালায় কনিক বিশ্রাম
 করিয়া চিত্রবিশ্রাম ভবনের পথে যাইতে হইবে। যে
 খানে গেলে আর ফিরিতে হয় না, সেখানে গেলে
 “আগার” ও “আগি” বলিয়া সমস্তই “আমিময়”
 হইয়া যায়, তাহাই আমাদের “নিজ নিকেতন”^x।
 সংসার আমাদের নিজ নিকেতন নহে। ইহা আগাদের
 আবাসক্ষেত্র। ভ্রান্তি বশতঃ সংসারের উপর আমিত্ব
 রূপ একটা আবরণ রচনা করিয়াছি। তাই “আমার
 সংসার আমার ঘর বাড়ি, আমার জিনিষপত্র” বলিয়া
 মনে করি। যাহা আমার জিনিষ, তাহা আমার সহিত
 চির অনিচ্ছিন্ন থাকা চাই। সংসার যদি “আমার
 জিনিষ” হইত, তাহা হইলে তাহার সহিত আমাদের
 কখনও বিচ্ছেদ ঘটিত না। সংসারে আসিবার পূর্বে
 সংসারের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না, মরিয়া
 গেলেও বর্তমান সংসারের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিবে

না । সুতরাং অতি অল্প সময়ের জন্য যাহার সহিত
 সম্বন্ধ, তাহা কি আমার জিনিষ হইতে পারে ? যাহা
 আমার সহিত নিত্যনিয়ত বিদ্যমান, তাহাই আমার
 নিজস্ব । অবিন্যাসবশতঃই সংসারকে “আমার” বলিয়া
 মনে করিয়াছি, তাই তাহাকে ছাড়িতে কষ্ট হয় ।
 কেননা যাহা “আমার জিনিষ” তাহার উপর আমাদের
 মায়া মমতা বসিয়া যায় । ছেলে পিলে ঘরকন্না স্ত্রী
 পরিবার সমস্তই “আমিহ মাথা” বলিয়াই আমাদের
 এত প্রিয়—এত রমণীয় । জগতের যে পদার্থ আমিহের
 অরুণ কিরণে প্রতিভাত তাহাই আমার লোভনীয় ।
 যে পদার্থে আমিহের সম্বন্ধ যে পরিমাণে আছে,
 তাহা সেই পরিমাণেই আমার ঘনিষ্ঠ । আমিহের
 সম্বন্ধ না থাকিলে জগতে কেহই কাহাকে ভাল
 বাসিত না । যাহা আমিহমাথা যাহা নিজস্ব, তাহা
 তুচ্ছ হইলেও তাহাই তাহার পক্ষে প্রিয় । রাজার
 প্রকাণ্ড অট্টালিকা পড়িয়া গেলে তাঁহার মেমন দুঃখ
 হয়, নিঃস্বল দীনের ক্ষুদ্র পর্ণকুটির পড়িয়া গেলেও

তাহার তেমনই মনোবেদনা উপস্থিত হয় । কেননা তাহার পক্ষে তাহা নিজস্ব । সম্রাট্ রাজক হারাইয়া যেমন যাতনা অনুভব করেন, তিস্কুকের একটি ফুটো ঘটি হারাইয়া গেলে সেই রূপ দুঃখ তাহার উপস্থিত হয় । আজ মহা সমরক্ষেত্রে সৌম্যমূর্তি বীরেন্দ্র কেশরীর যুত্ব হইলে সে সংবাদে তোমার যে দুঃখ না হয়, তোমার একটি খাঁদা ছেলের কোন রূপ একটু অসুখ হইলে তাহা অপেক্ষা গভীর দুঃখ মাগরে ডুবিয়া যাও । কেননা তাহা তোমার “ নিজ সামগ্রী ” । বাল্য কাল হইতে দীর্ঘ ২ বয়োবুদ্ধির সঙ্গে ২ শিক্ষা ও সঙ্গেও এই আশিষ জ্ঞানের বিস্তার হয় । শিশু প্রথমে মাকে “ আমার ” বলিয়া বুঝে, পরে পিতাকে, তৎপরে প্রতিবেশীকে, কুটুম্ব আত্মীয় স্বজন বহু বাক্যকে “ নিজস্ব ” বলিয়া বুঝে । তদনন্তর যৌবনে স্ত্রী পরিবার পুত্র পৌত্রাদিকে আপনার বলিয়া অনুরাগ করে । এই রূপ আশিষ জ্ঞানের ক্রমিক বিকাশ হয় । এই “ আশিষ ” আমাদের অস্তিতে ২ স্বচ্ছার ২ প্রতি স্নায়

শিরার অণু পরমাণুতে বিভাজিত। পা দ্বিতীয় মত যেমন
 প্রস্তরের তলদেশ ভেদ করিয়া বন্ধগুলি হয়, সেট রূপ
 এই "আমিহ" বল্লরীর মতাদেশ আগাদের মনঃ প্রাণ
 আশ্রিত অন্তস্তল ভেদ করিয়া চরিয়া গিয়াছে। এ খাট-
 মস্তক শিকড়কে আমরা উঠাইতে অসমর্থ। আগাদের
 কৌণ শক্তি "আমিহ জ্ঞানের" নিকটে পরাস্ত হইয়া
 তাহারই পদতলে বিলুপ্ত হয়। জানি "আমিহ"
 পরিভাগ করিতে পারিলে কৌণ শুধী হয়, জানি "অহং
 মমতি" জ্ঞান বিবর্জিত হইতে পারিলে পরমা নিবৃত্তি
 লাভ হয়, কিন্তু আগার মত মায়ামমতানিমোহিত
 আসক্তি প্রাণ জীবের পক্ষে তাহা অকালকুসুম। আমিহ
 ভাগ করিতে পারি নাই। কিন্তু এই ক্ষুদ্র আমিহকে
 বিস্তৃত করিয়া লইতে পারি। আমিহের ভাগে
 যেমন স্থল, আমিহের বিষ বশান-বিস্তৃতিতে তেমনই
 স্থল। আমিহের ক্ষেত্রে আমরা বর্জিত করিয়া লইব।
 মংলায়ের ক্ষুদ্র গ'ওতে আশ্রয় না হইয়া আমিহ যেদিন
 বিশ্বপতির অনন্তগতির বিমীন হইবে—তবে নিশ্চিত

বিন্দু মাত্র তৈলের ন্যায় তাৎপদার্থে ব্যাপিয়া থাকে, সংসারের ক্ষুদ্র পিঞ্জর পরিহার করিয়া আশিষ্য মেদিন পরম বিদুর চরণাক্রমে উদ্ভাসমান হইবে, সেই দিনই আশিষ্যের পূর্ণ পরিণতি। সেই দিনই তাহার চিত্র সমাপ্তি হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি, যাহা আমার নিজ সম্পত্তি তাহা বড় মধুর, বড় সুন্দর। তিন ২ করিয়া সংগ্রহ পূর্বক তিলোত্তমার অপূর্ণ সৌন্দর্য্য মাধুরী যেমন বিরচিত হইয়াছে, সেট রূপ জগতের মাহা কিছু ললিত, মাহা কিছু কমলীয়, মাহা কিছু মনোমোহন, সে সমস্তের মার মর্কস্ব সমষ্টিগত হইয়া “আমার” জিনিষে যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তাহে “আমার” কথাটি শুনিতে মিষ্ট, বলিতে মিষ্ট ভাবিতেও মিষ্ট। মাহা আমার, তাহাই যে আমার পক্ষে উত্তম, অর্থাৎ ভিত্তিকারী, অথবা মাহা উপকারী, তাহাই আমার শিষ্ট কিনা, এ সমস্ত তত্ত্বকথা এখন বিচার করিবার অবসর আমার মাই। আসি যে এত রূপ বলিয়া আসিলাম, তাহার

তাৎপর্য নহে যে, বাহ্যিক চরদিন “আমার”
 নলিয়া বুঝিয়া আসিয়াছি, তাহার কুহকে আমরা
 নলিয়া যাই, তাহার আসক্তিতে আমরা ডুবিয়া গাঠ ।
 তাহার শুণাশ্রুণের দিকে তাকাই না । তাহার শোভন
 অশোভনের দিকে আক্কেপ করি না, প্রাণের একটানা
 স্রোত সেই কেন্দ্র স্থলের দিকে মানিত হয় । অগতের
 চক্ষে তাহা সূনিত ০ষ্টক তুচ্ছ হউক, অন্তরের টান
 কিন্তু কি জানি কেন সেই দিকে তীব্রবেগে প্রবাহিত
 হয় । কলিকাতা হইতে কোন স্তূদ্রবর্তী পল্লীগ্রামে
 তোমার হয়ত নিজগৃহ । কলিকাতায় কার্য্যোপলক্ষে
 ভূমি প্রবাস করিতেছ । কলিকাতা অতি সুন্দর নগর,
 অতি সমৃদ্ধিশালী নগরী । কলিকাতার চক্ষে তোমার
 কল্যাণভূমি পল্লীগ্রাম নিতান্ত কদর্য্য স্থান হইতে পারে,
 কিন্তু তোমার চক্ষে তোমার পল্লীগ্রাম স্বর্ণ হইতেও
 গরীবান্ । কেননা তোমার নিজের নিকেতন তথায়
 বিদ্যমান । তাই নিলাসের নন্দন কানন কলিকাতায়
 থাকিয়াও অনগর পাইলেই বাড়ি যাউবার বাসনা

তোমার প্রাণে জাগিয়া উঠে । কলিকাতার মহত্ব
 প্রলোভনসম পদার্থ রাশির উজ্জ্বল নিভা তোমার
 প্রাণের ভিতরে লীলা করিলেও সে সমস্তের উপর
 তোমার নিজ নিকেতনের গুণ মাধুরী কি জানি কেন
 শাসিয়া উঠে । নিজসামগ্রীর এমনই মাহাত্ম্য এমনই
 কুণ্ডলিনী আকর্ষণী শক্তি আছে । তোমার নিজত্ব—
 তোমার আগ্নেয় তোমার স্বদেশের সহিত কলিকাতা
 অপেক্ষা নাকি বহুদিন হঠাৎ বহুপরিমাণে নিজড়িত,
 তাই কাঁচার প্রতি তোমার এত মায়ী এত সমতা ।
 তাই বাড়ির জন্য এত ভালিয়া । বাহ্যশরীরী জীবের
 বহির্জগতের বাড়ির প্রতি যেমন আগ্রহ, সেই রূপ
 অন্তঃশরীরী অন্তরাঙ্গের নিজ নিকেতনে ঘাইবার
 আবেগ সূচ্য ভাবে জিয়া করিতেছে । কিন্তু ভ্রান্তি
 বশতঃ যাহাকে জীব নিজের বাড়ি বুঝিয়া ভালিয়াগিয়া
 ফেলিয়াছে, তাহা ত পান্থশালা । আবার যাহা বাস্তবিকই
 নিজ ধাম, যাহাকে নিজের জিনিস ভাবিয়া ভাল
 বাসা উচিত বলিয়া শাস্ত্র নির্দেশ করিয়াছেন, সে

দিকে ত্যাগ যাইতে চাহেনা। মনঃ ত্যাগ ত সে পথের
পথিক হইতে চাহেনা। সুতরাং এ বিভ্রাটের উপায়
কি ?

শাস্ত্র বলিতেছেন ভগবানের নির্মলধামটী জীব।
তোমার শাস্ত্রময় নিজ নিকেতন। ভগবানই তোমার
শ্রুত অস্থায়ী। তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে পরম
সুখ প্রাপ্ত হইবে। শাস্ত্রের একথা মনঃ ত্যাগ কিঞ্চ
সায় দিতে শীঘ্র সাহস করে না। বিকৃতিময় চিতে
কোন সন্দেহের তরঙ্গ উঠিতে থাকে। ঈশ্বরকে লাভ
হইলে সুখ লাভ হয়, একথা আমার মলিন অন্তঃকরণ
প্রতিধ্বনি করে কৈ ? বরং বিপরীত ভাবনার উদয়
হইয়া থাকে। একটা গল্প বলিয়া সে বিপরীত ভাবনার
সমর্থন করিতেছি। কোন একটা গল্পলোক পাগলদের
আচার ব্যবহার দেখিবার জন্য এক উম্মাদ-শালায়
[পাগলা গারদে] গিয়া উপস্থিত হন। তিনি পাগল-
দের রীতি নীতি চাল চলন দেখিয়া বেড়াইতেছেন,
এমন সময় একটা পাগল তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া

জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয় আপনার মনটি শুষ্ক যন্ত্র আছে।
অনুগ্রহ করিয়া উত্তর দিবেন কি ?

ভদ্রলোক । কি প্রশ্ন, বল ।

পাগল । লোকে বলিয়া থাকে, নিদ্রায় সুখ লাভ
হয় । আমি কিন্তু কপাটা বুঝতে পার না । আপনার
মত কি ?

ভদ্রলোক । আমার আপনার মত কি ? নিদ্রায় সুখ
হয়, ইহা ত ঠিক কথা, তাকা তুমি বুঝতে পার না,
এই জন্যই ত লোকে তোমায় পাগল বলে ।

পাগল । ওচ্ছা আমি নাহয় পাগল । আপনি ত
পাগল নহেন, কপাটা আমার বুঝাইয়া দিন দেখি,
নিদ্রায় কোন সময়ে সুখ হয় ।

ভদ্রলোক । কেন, মগনই নিদ্রা আসে তখনই ত
সুখদোষ হয় ।

পাগল । কোন প্রিয় বস্তু পাইবার সময়ে মতকণ
পর্যন্ত সে বস্তুটি সম্পূর্ণ রূপে না পাইয়া মাইতেছে,
ততকন মনে একটা আকুল নিকুলিই জন্মিতে থাকে,

ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ମୋର ଆଶା ମନେ ଉଠିବାରୁ ହେଉଛି ଧାକେ,
 ଯଦି ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ । ଅନ୍ତରାତ୍ମ
 ନିନ୍ଦା ଯଦି ଅନ୍ତରାତ୍ମ ନାହିଁ ହେଉଛି, ତେବେ ସେହି ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁର
 ସମାଗମ ନାହିଁ ହେଉଛି । ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା ତ ଧାକେ ଧାକେ,
 ଅନ୍ତରାତ୍ମ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ତରାତ୍ମ ହେଉଛି କେମିତି କରାଯାଏ ?

ଭଦ୍ରଲୋକ । ଆଜ୍ଞା ନିନ୍ଦାର ଆଗମନ ସମୟେ ଅନ୍ତରାତ୍ମ
 ହେଉଛି, ନିନ୍ଦା ଆସିଲା । ଯେତେବେଳେ ତ ଅନ୍ତରାତ୍ମ ପାରିବ ।
 ନିନ୍ଦାର ଉପଭୋଗ କାଳେ ତ ଅନ୍ତରାତ୍ମ ସମସ୍ତ ।

ପାଗଳ । ତାହା ହେଉଛି କେମିତି କରାଯାଏ ହେଉଛି ପାରିବ ?
 ନିନ୍ଦାର ସମୟେ ତ ତୁମ୍ଭେ ଗାତ ଅନ୍ତରାତ୍ମରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମ ପାରିବ,
 ତୋମାର ମନରେ ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମସ୍ତ ତ ସେ ସମୟେ ଅନ୍ତରାତ୍ମ
 ପାରିବ, ଅନ୍ତରାତ୍ମ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ତରାତ୍ମ ହେଉଛି କେମିତି କରାଯାଏ ?

ଭଦ୍ରଲୋକ । ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ନିନ୍ଦା ଭଦ୍ରଲୋକ ସମୟ ଅନ୍ତରାତ୍ମ
 ହେଉଛି ।

ପାଗଳ । ନିନ୍ଦା ଯଦି ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି, ତେବେ ତାହାର
 ବିଚ୍ଛେଦେ ଅନ୍ତରାତ୍ମ ହେଉଛି ଏ କେମିତି କଥା ? ପ୍ରିୟ ବିଚ୍ଛେଦେ
 ଧାକେ ହେଉଛି ପାରିବ । ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁର ସମୟେ ଅନ୍ତରାତ୍ମ ହେଉଛି, ଯଦି ତ

পাগলেই বলিতে পারে। এখন ভাবুন দেখ, আপান
পাগল, কি আমি পাগল।

ভদ্রলোকটি নরকতর। তখন পাগল আবার বলিল,
নিদ্রার কি আগমন সময়ে কি উপভোগ কালে কি ভঙ্গে
কোন সময়ে যে সুখ লাভ হয় তাহাতো বুঝিলাম না।
নিদ্রাতে সুখ হয় ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। আমার
তো এই মত। আমার এই মতের সহিত সাধারণ জগতের
মত মিলেনা, তাই তাহারা আমাকে পাগল বলে। তেমনি
আমার মতের সহিত তাহাদের মত মিলে না, সুতরাং
আমিও তাহাদিগকে পাগল বলিতে পারি। জগতের
সকলেই নরক পাগল।

✕ পাগলের মনে যেমন আশঙ্কা, কল্পিয়াছিল, আমাদের
মত পাগলের মনেও সেই রূপ ঐশ্বর মন্বকে আশঙ্কা
উপস্থিত হয়। শাস্ত্র বলিতেছেন ঐশ্বর প্রাপ্তিতে সুখ
লাভ হয়, কিন্তু কোন সময়ে সুখ হয় তাগত বুঝিতে
পারি না। ঐশ্বর রূপ পরম প্রিয় বস্তু সমাগমের সময়ে
প্রিয়বস্তু পাটনার আশায় উৎকণ্ঠাময়ী মনবক

ব্যাকুলতা চিত্তকে ঘিরিয়া ফেলে। সুতরাং সে সময়ে
 শান্তি কোথায় ? আমার ঈশ্বরকে যখন প্রাপ্ত হইলাম,
 তখন তাঁহার অনন্ত চিদেকরসমাগরে আমার আঁমিহ
 ডুবিয়া যায়। সে অকূল পাথারের তীর তরঙ্গে আমার
 আঁমিহ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারা হইয়া কোথায় ভাসিয়া
 চলিয়া যায়। আঁমিহ তখন মরিয়া যায়। সুতরাং সে
 রস, সে শান্তি তখন উপভোগ করিবে কে ? পূর্বেই
 প্রতিপন্ন করিয়াছি, "যাহার সহিত" আঁমিহের সম্বন্ধ
 আছে, তাহাকেই আমরা ভাল বাসি, তাহাই আমাদের
 পক্ষে প্রিয় পদার্থ। ঈশ্বরের কাছে আমাদের আঁমিহ
 যখন স্থির হইয়া দাঁড়াইতেই পারেন, তখন আঁমিহের
 সহিত তাঁহার সম্বন্ধ থাকিল কে ? সুতরাং ঈশ্বরকে
 "আমার জিনিষ" ভাবিয়া ভাল বাসিতে পারি কে ?
 ভালবাসার রাজ্যে যে আঁমিহ প্রধান মন্বন, ঈশ্বরের
 অনন্ত চিদগিচ্ছটায় পুড়িয়া তাহা মন চারখাণ হইবে,
 তখন ঈশ্বরকে "আত্মীয়" বলিয়া ভাবিতে পারি কে ?
 সুতরাং, শাস্ত্র ত বলিলেন, স্বীয় ! ঈশ্বরই তোমার

অস্বীকৃত তাঁহাকেই ভাল বাস; কিন্তু আমাদের অস্বাধ
 মন ত তাহা মানিতে চাহে না। আমরা মুখে বলি ঘটে
 তাঁহাকে ভাল বাস, কিন্তু তাহা ত কায়ের কথা নহে।
 ভাল বাসার গতি একদিকেই ছুটিয়া থাকে। আমাদের
 ভাল বাসা যদি ঈশ্বরে সমাপ্ত হইত, তাহা হইলে
 পুনরায় তাহা সংসারের দিকে ধাবিত হয় কেন ?
 আমাদের জন্মের প্রেমসিংহাসনে সংসারকে বসাইয়া
 ফেলিয়াছি, সুতরাং তিনি তথায় বসিবে কেন ?
 নন্দামার কৃমিলিট যথায় কিলিবিলা করে, রাজরাজেশ্বর
 তথায় কি বিলাস করিতে পারেন ? জগন্নাথার চর-
 সুন্দর মাধুরী ১০০টা ময় হইয়া যদি তাঁহাকেই মনঃ-
 প্রাণে ভাল বাসিতে পারিতাম, তবে আর সংসারের
 স্ত্রীকণের দিকে আগন্তর কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারি-
 তাম কি ? একটি প্রকৃত ঘটনা মনে হইতেছে। এক
 পরম সুন্দরী বেশী। নগরীর পথ পার্শ্বে বেশভূষায়
 সজ্জিত হইয়া রূপের মাধুরী ছড়াইতেছে, এমন সময়ে
 একজন পাপক মাধু তাহার সম্মুখে আগিয়া পড়িলেন।

ଦେଖାଟିକେ ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରୀମତୀ ଦେଖିଆଇ ମାଧୁ କାନ୍ଦିତେ
 ଲାଗିଲେ । ତାହାର ଡୁଟି ଚକ୍ଷୁ ଦିଆ ଅନ୍ତରାଳ ବାହାରେ
 ଲାଗିଲ । ବେଶ୍ୟା ଭାବିବ ବୋଧ ହେଉ ତାହାର କେନ ଅପ-
 ରାଧେ ମନ୍ୟାହତ ହେଉ ମାଧୁ କାନ୍ଦିତେଲେ । ବେଶ୍ୟା ଭୀତ
 ହେଉ କରମୋଡ଼େ ବାଳିଲ, ଶ୍ରୀମତୀ ! ଆପଣ କେନ
 କାନ୍ଦିତେଲେ ଆମି ଯଦି କେନ ଆପଣାର ନିକଟ ଅପରାଧ
 କରିଆ ଥାଏ ତବେ ମାଞ୍ଜନା କରୁନ । ମାଧୁ ବାଲିଲେ
 ସୁନ୍ଦର ! ମା ! ତୁମ ଆମର କେନ ଅନିଷ୍ଟ କର ନାହିଁ,
 ଆମି ତାହାର କ୍ଷମା କାନ୍ଦିତେଲେ ନା । ତୋମ୍ଭର ଐ ଅପରାଧ
 ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଲହରୀର ଲାଲ ଗିଲମ ଦେଖିଆ ଆମର ମନେ
 ଚଢ଼ିଲ ସେ ମୋନ୍ଦସୋର ଆମର ହେତେ ବିନ୍ଦୁମାଂସ କ୍ଷୀରିତ
 ହେଉ ମଂସାଗେର ଏହି ନାମାନ୍ତ ରୂପ ଶ୍ରୀମତୀ ହେଉଛେ,
 ନା ଜାଣି ସେ ଆମର କର୍ତ୍ତୃ ଶ୍ରୀମତୀ କର୍ତ୍ତ ସୁନ୍ଦର । ସେହି ଅନନ୍ତ
 ମୋନ୍ଦସୋର ମାଗରକେ ଏଜନମେ ଦୋଷତେ ପାହିଲମ ନା,
 ତାହି ମନ୍ୟାବେଦନା ଆକୂଳ ହେଉ କାନ୍ଦିତେଲେ । ଯିନି
 ଶ୍ରୀକୃତ ଭକ୍ତ, ଯିନି ତାହାର ଭାବନାମାମ ଲାଗିଲ, ତାହାର
 ଉଦ୍ଧାର ମନ୍ୟାବେଦନା । ଆମ ଆମାଦେର ମତ ଅପମ ମଂସାର

পাগলের মাহ। মর্গকথা, তাতা পূর্বেই বলিয়াছি।
 আমরা আগিহ লটগাটে নিব্রত। যে কিনিষটিকে আগার
 বলিয়া আশ্রিত করিতে পারি, তাতা লইয়াই আমরা
 সুখী হইতে চাই। আমাদের আগিহ সংসারের সহিত
 অধিক পরিমাণে জড়াইয়া গিয়াছে তাই তাঁহার রাক্ষ্য
 যাতে ভীত হয়। সংসারের গঠন কানন হইতে আগিহ
 বহ্নীর মূলোৎপাটন করিয়া ভগবানের প্রোমোদ্যানে
 তাতাকে রোপণ করিতে হইবে। সেই দেশের অমৃত
 সলিল যখন তাঁহার মূল দেশে সিক্ত হইবে, সেই
 দেশের নসন্ত নাম্ন যখন তাতার নিম্ভুক শাখা পল্লবের
 উপর দিয়া ধীরে প্রসারিত হইবে, তখন সেই আগিহ-
 লতায় সে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবে, তাহার গৌগন্ধে দিগন্ত
 আশ্রিত হইয়া উঠিবে, ভূমি ভরিয়া গাঠিবে। যে
 ফল ধরিলে, তাহার স্তরমে ত্রিভুবন পরিভূত হইবে।
 সর্গলোক হইতে দেবগণ আগিয়া সে ফলের মৌরত
 আশ্রাণ করিয়া নিমোহিত হইবেন। সে ফল কেনল
 নস ভরা, তাতাতে এমন বীজ নাই যে আবার সংসারে

পাতিত হইয়া পুনরাবৃত্তির সূচনা করিলে । এ ফলে সমস্ত ফলকামনাই নিঃশেষ হইয়া যায় ।

পূর্বেই বলিয়াছি, আগ্নেয় হইতেই ভালবাসার উৎপত্তি । কিন্তু এট আগ্নেয়ই নগ্ন ভালবাসার পূর্ণ পরিণতি হইবে, তখনই তাহা আদর্শ হইয়া দাঁড়াইবে । ভেদবুদ্ধির গর্ভে ভালবাসার জন্ম, কিন্তু অভেদবুদ্ধির আগারে পূর্ণিয়ার চক্ষুগার মত যে দিন ভালবাসা পতি পুষ্ট হইয়া উঠিলে, সেই দিনই তাহার চরমোৎকর্ষ । বৈকল্পিক ভালবাসার ভিত্তি রচনা করেন, কিন্তু অভেদ-বুদ্ধি যে দিন নিজক্রোড়ে তুলিয়া সেই ভালবাসার পার্শ্ব দোহে স্বর্গীয় তেজের সঞ্চায় করিয়া দিবে, সেই দিন ভালবাসা যুক্ত, সোপান হইয়া দাঁড়াইবে । ভাল বাসা ও ভাল বাসার উৎসাহগা পদার্থ ও যিনি ভাল বাসেন এই ত্রিধারা মিলিয়া যে দিন এক দারায় প্রবাহিত হইবে, তিনটি মিলিয়া যে দিন একটিতে মিশিলে, সেই দিনই ভালবাসার পূর্ণ পর্যাগমন । শুভবা অভেদই ভাল-বাসার লক্ষ্য । এই কন্যারূপা শ্রীকৃষ্ণের সচিব অচিন্ত,

শ্রীকৃষ্ণও রাধার সহিত অভিন্ন। রাধা আমার প্রেমের
সহিত অভিন্ন, এটী জন্য তিনি প্রেমময়ী। শ্রীকৃষ্ণও
প্রেমের সহিত অভিন্ন, এটী জন্য তিনি প্রেমময়। কীর ও
কীরের পুতুল যেমন অভিন্ন পদার্থ, সেই রূপ প্রেম ও
প্রেমের পুতলী রাধাও একই পদার্থ। এই রূপ আমি,
আমার জিনিস ও আমার জিনিসের প্রতি ভালবাসা
এই ত্রিহ মিলিয়া যে দিন একত্রে পরিণত হইবে, সেই
ত্রিণেপী সম্মুখে জীব যে দিন অবগাহন করিতে পারিলে,
সেই দিনই তাহার আত্মা চরিতার্থ হইবে।

“আমার জিনিস” বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ “আমিকে”
স্বতন্ত্র রূপে বুঝা চাই। নিজ নিকতন বুঝিতে
হইলে প্রথমতঃ “নিজ জিনিসটি প্রতিপন্ন করিতে
হইবে। যেমন একটি মাকার বিষয়ের উপর পাঁচ
ভাইয়েরই অধিকার আছে। কিন্তু কে কোন্টুকুর মালিক,
তাহা অগ্রে প্রমাণিত না হইলে এতোকের বিষয়ে স্বত্ব
মান্য হইবে কেন। সুতরাং স্বত্ব মান্য করিতে হইলে
অগ্রে মালিক ঠিক হওয়া চাই। আমার জিনিসটিও

সেই রূপ সাক্ষার বিষয়। এই সাক্ষার বিষয়ের কোন
টুকুতে কোন “আমি” প্রকৃত মালিক, তাহার নির্ণয়
হওয়া চাই। যখন কোন স্ফটিক বস্ত্র হইয়া শরীরকে
আচ্ছাদন করিবার সময় নহি, “আমি কাপড় পরিতেছি”
তখন শরীর “আমি”। কেননা শরীরে অহং বুদ্ধি
হইয়াছে। যখন কোন রূপবতী যুগতীর রূপভরণে
মগ্ন হইয়া চক্ষুরিন্দ্রিয় পরিত্যক্ত হইতেছে, তখন চক্ষু-
রিন্দ্রিয় “আমি”। এই রূপ আবেশিন্দ্রিয়াদি আমি
যখন স্বপ্নে স্থানান্তরিত করিতেছি, কিম্বা চিন্তার গভীর
মাগরে ডুবিয়া আছি, তখন মনই “আমি”। যখন
ক্ষুধা তৃষ্ণা আকুল হইয়া ভ্রমনার্থ দৌড়িতেছি,
তখন প্রাণ “আমি”। আমার যোগানন্দক্ষুধা পান
করিবার জন্য যখন ছুটিতেছি তখন আত্মাই আমি।
সুহৃৎ বস্ত্রাদি হইতে যোগানন্দ পর্যাণ্ড সমস্তই
“আমার জিনিস” অর্থাৎ সাক্ষার বিষয়। আর শরীরাদি
যেমন পাঁচ ভাই তাহার অধিকারী। শরীর রূপ
“আমির” মাহা বিষয়, তাহাতে ইন্দ্রিয় রূপ আমির

অধিকার নাই । মন রূপ “ আমির ” যাহা
 নিরুপ, তাহাতে আত্মরূপ আমির দাবিদাওয়া নাই ।
 সুতরাং প্রত্যেকের অধিকার ভিন্ন ২ বিষয় ৩ ভিন্ন ২
 মালিকও ভিন্ন ২ । আজ কনিষ্ঠের বিষয়ে জ্যেষ্ঠ
 যদি হস্তক্ষেপ করিতে যান, তবে তাহা যেমন অনাধি-
 কারচর্চা, সেই রূপ শত্রুরাতির উপভোগ্য বিষয়কে
 আত্মা যাদ “ আমার জিনিস ” বলিয়া কাড়িয়া লইতে
 যান, তাহা হইলে আইনানুসারে তিনি দণ্ডনীয় ।
 সুতরাং আইনের সূক্ষ্ম কষ্টিপাত্রে কাষয়া বুঝা গেল,
 প্রত্যেকের বিষয় স্বতন্ত্র । আনি রূপ অধিকারীও ভিন্ন ।
 এত জ্ঞান আনি রূপ কনিষ্ঠাদি ভাইয়ের মধ্যে যেই
 আমিই প্রকৃত জ্যেষ্ঠ, যে আমি যাদিগে জগতে আছি,
 অর্থাৎ যে আমি আমার পু. পি. ইলাস, বর্তমানে
 আছি, ও ভবিষ্যতে থাকিব । সেই আমিই জ্যেষ্ঠ,
 জ্যেষ্ঠ, ও বারিষ্ঠ, যে “ আমির ” পরিবর্তন নাই, হ্রাস
 নাই, বৃদ্ধি নাই, বিনাশ নাই ক্ষয় নাই, অটল অচলের
 ন্যায়, হিরণ্ময়ী গভীর সাগরের ন্যায় এ অনন্ত কাল-

বকে যিনি দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত “আমি”। যে আমি আমাদের অন্তর্জগতে বাস করায় আমাদের মনঃপ্রাণ ইন্দ্রিয় তাঁহার আলোকে আলোকিত হইতেছে, যে “আমার” ব্যাপকতাময়ী সত্যর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভূমিমা গিয়াছে, সেই আমিই প্রকৃত আমি। অসময় প্রাণমনাদিকোষ হইতে সেই আমিকে বাহিরা লইতে হইবে। চম্পক কুসুমের গন্ধ যখন পার্থিব বায়ু স্তর ভেদ করিয়া আমাদের শ্রাণপণে আবির্ভূত হয়, তখন সেই বায়ুস্তর গত কৃত প্রকৃত পরমাণু তাহার সহিত মিশ্রিত হয়, কিন্তু সেই মিশ্রিত পরমাণু হইতে চম্পক গন্ধ যেমন স্বতন্ত্র পদার্থ, সেইরূপ সংসারের পাঁচ মিশ্রাণি জিনিষ হইতে আত্মাকে স্বতন্ত্র রূপে বঝিতে হইবে। এত অজ্ঞান যাহা নিজস্ব তাহাই “আমার জিনিষ”। সংসার আত্মার নিজস্ব নহে, কেমনা শরীরাদিই তাহার মালিক, তাহা পূর্বক প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং শরীর ইন্দ্রিয়াদিন সাতা নিজ শন, তাহার উপর তাহাদের কাল বাস না আসক্তি

অগ্নিতে পারে, কিন্তু আত্মার সহিত তাহার কোন
সম্বন্ধ নাই। কেননা আত্মা নির্লিপ্ত। এই নির্লিপ্ত আত্মার
নিজ সামগ্রী কি? স্বস্বরূপই ইহার নিজ সামগ্রী। ইহা
ছাড়া আত্মার আমার জিনিষ বলিবার আর কিছু নাই।
সুতরাং স্বস্বরূপই তাঁহার ভালবাসার ধন। যেহেতু জগৎ
হইতে উৎপন্ন হইয়া ভালবাসা যখন এই স্বস্বরূপ গত
হয়, প্রেম, প্রেমের জিনিষ ও যিনি প্রেম করেন এই
ত্রিবিধ ভেদ মিটিয়া গিয়া প্রাণ প্রেমের ও প্রেমাতা
এই ত্রিভু বিনষ্ট হইয়া যখন সমস্তই আত্মরতিতে পর্যা-
বসন্ন হয়, তখনই ভালবাসার চূড়ান্ত আদর্শ। তাই
পূর্বের বলিয়াছি অভিন্নতাই প্রেমের উদ্দেশ্য।

†এত ক্ষণ ধরিয়া নিজ সামগ্রীটি কি, “আমি” পদার্থ
কি, তাহার আলোচনা করিলাম। এখন নিকটনের
স্বরূপ কি লক্ষণ কি, তাহা প্রতিপাদন করিতে হইবে।
যেখানে আমি ও আমার সমস্তই মিলিয়া আমিসন্ন হইয়া
যায়, সেই অদ্বৈতধামই জীবনের নিজনিকটন। যেমন
অগ্নিপিণ্ড হইতে নিক্ষু লিঙ্গ রাশি চারিদিকে বিকীরণ

হয়, জ্যোতিঃসমষ্টিমা সূর্য্য হইতে কিরণ রাশি ইত্যন্ততঃ
 বিকিণ্ড হয়, সেই রূপ সমষ্টিভূত পরমাণুপিণ্ড হইতে
 এই ব্যষ্টি জীবাত্ম সমূহ নিঃসৃত হইয়াছে । স্তব্ধতাং যে
 কেন্দ্রস্থল হইতে বিচ্যুত হইয়া কক ভ্রষ্ট লক্ষ্য নক্ষত্রের
 ন্যায় জীবাত্মা বিচরণ করিতেছে, সেই কেন্দ্রস্থলই
 জীবের সম্মিলন স্থল, সেই দেশেই তাহার নিজ
 নিকেতন । বহুদিন হইতে সে আবাগম্বানের পন্থা
 ভুলিয়া গিয়া আমরা আপথে কূপথে ঘুরিতেছি । আমরা
 বাড়ি হারাইয়া ফেলিয়াছি বটে, কিন্তু বাড়ির চিহ্ন যদি
 জানা থাকে, তাহা হইলে গেই চিহ্ন ধরিয়া পুনরায়
 বাড়ি পৌছিতে পারি । চিহ্ন জানা না থাকিলে হারান
 জিনিসের কিনারা করা কঠিন । তুমি গৃহস্থ, তোমার
 হয় ত এক খানি থালা চোরের লইয়া গিয়াছে । পুলিশ
 হয় ত সেই বাসাল শুদ্ধ চোরকে আদালতে হাজির
 করিল । বিচারক তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ
 জিনিষটি কি তোমার ? সেই জিনিষটির কোন চিহ্ন যদি
 তোমার না জানা থাকে, তবে তুমি কেমন করিয়া

শপথ করিয়া বলিতে পার, সেই জিনিসটি তোমার ।
 সুতরাং হারান জিনিসের চিহ্ন জানা চাই । ক্ষুদ্র একটি
 শিশু খেলা কবিতার ক্ষমতা বাড়ির বাহির হইয়াছে ।
 খেলা খুলা সাজ করিয়া সে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে চায় ।
 কিন্তু সতরের গলি ঘূঁজিতে পড়িয়া সে বাড়ির রাস্তা
 ভুলিয়া গিয়াছে । মা'হার বাড়িহার শিশু রাস্তায় ২
 কঁাদিয়া বেড়াইতে লাগিল । রাস্তার লোকে তাহাকে
 জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বাড়ির কিছু চিহ্ন মনে আছে
 কি ? তাঁহা হইলে তোমাকে বাড়ি লইয়া যাইতে
 পারি। অবোধ শিশুর অত কি মনে থাকিতে পারে ?
 সে কঁাদিয়া বলিল তাহার বাড়িতে দরজা আছে ।
 আমরার ঐ অবোধ বালকের লায় অজ্ঞানভ্রান্ত জীব ।
 সংসার নগরীতে খেলা করিতে আসিয়া বিষম গলি
 ঘূঁজিতে পড়িয়া বাড়ির রাস্তা ভুলিয়া গিয়াছি । মা'হার
 শিশুর দায় এ অকূল প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি ।
 কেবল বাড়ির দুই চিহ্নটি আমাদের জানা আছে । সে
 চিহ্ন এই—

যদগদা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ।

“যেখানে গেলে আর ফিরিতে হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম” ।

সংসারের গোলোক ধাঁদায় পড়িয়া পথভ্রাস্ত্র জীব আমরা বাড়ি ফিরিয়া যাইতে চাই । আমাদের ক্রন্দন কোলাহল শুনিয়া পথের ধারে নানা প্রকৃতির ও নানা সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হইয়া বলিতেছে আমাদের গৃহিত আইন তোমাদিগকে বাড়ি লইয়া যাইব । কিন্তু ইহারা সকলেই উহাদের নিজ বাড়িতেই আমাদিগকে লইয়া যাইতে চান, তথায় গেলে আমরা শাস্তি পাইব কেন ? আমাদের নিজ বাড়িতেই আমরা যাইতে চাই । যেখানে আমাদের স্বজন বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় কুটুম্ব ভাই ভাগিনীগণ অবস্থিতি করিতেছেন তাহাই আমাদের নিজ বাড়ি । আমরা তাঁহারই চরণে শরণ চাই, যিনি আমাদিগকে নিজ বাড়িতে লইয়া যাইবেন । মহাত্মা গৌরানন্দন যখন অল্পবয়স্ক শিশু, তখন তিনি পথের ধারে এক দিন খেলা করিতেছিলেন । তাঁহার গায়ে বহুখলা অনেক অলঙ্কার দেখিয়া এক ছুটু তরুণের

লোভ লাগিল। তব্বর গৌরকে বলিল, আইস তোমার
 কোলে করিয়া বাড়ি পৌঁছাইয়া দি। এই বলিয়া চোর
 গৌরকে কোলে করিয়া অলঙ্কার গুলি কাড়িয়া লইবার
 জন্য নিজের অভিমত স্থানে চলিল। কিন্তু বিপাতার
 বিচিত্র নীলা কে বুঝবে, চোর নিজের বাড়িতে
 পৌঁছিতে না পারিয়া গৌরানন্দবের বাড়িতেই
 উপস্থিত হইল। আজ তব্বরের তীব্র প্রতিকূলতা ভেদ
 করিয়া যে শক্তি—গৌরানন্দবের যে জীবন মোহিনী
 দিব্যানিস্তুতি মহাপ্রভুকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিল, আমরা
 সেই মহীয়সী শক্তির অভয় আশ্রয় অবলম্বন করিতে
 চাই। সে শক্তিকে বাহিরে অন্বেষণ করিতে হইবে না।
 আমাদের ভিতরেই তাহা আছে। আমরা বাড়ির পথ
 চিনি না। হুগ্ধি বাঘা কুহকিনী মায়া আমাদের পথ-
 ভ্রষ্ট করিয়া আমাদের গথা গর্ব্বন দন লুটিয়া লটতে
 চায়। যোগ অন্ধকারে জ্বলন্ত দীপের ন্যায় অগ্নিদায়ক
 অন্ধতমগাচ্ছন্ন দুর্দিনে যে শক্তি আমাদের নিগূঢ়
 মার্গের সূচনা করিয়া দিবে, আমরা তাহার কথা না

শুনিয়া তাঁহার দিকে না তাকাইয়া আর তাহার কাছে
 ভরসা করিব। আমাদিগকে গব্বদা সচেতন করিবার
 জন্য সে অন্তঃশক্তি অবিরত গেষ্মান করিতেছেন,
 বাহিরের ভূমূল কলরবে তাহা আমরা শুনিতে পাই
 না। আমাদের বাহিরের ইন্দ্রিয় গ্রাস যখন স্তম্ভিত
 হইয়া যাইবে, বাহিরের সমস্ত আড়ম্বর যখন নিস্তক
 হইয়া আসিবে, বাহিরের ব্যুত্তি সমূহ যখন অন্তর্মুখীন
 হইতে পারিবে, তখনই ভিতরের কথা শুনিতে পাইব।
 বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে যখন মৃত হইয়া যাইব, তখনই সে
 অন্তর্দেবতার অন্তর্ধ্বনি শুনিতে পাইব। আমরা
 বাহিরের ব্যাপার লইয়া যখন নিতান্তই বিমুগ্ধ হইয়া
 পড়ি, বাহিরের কোলাহলস্বরূপে ডুবিয়া যখন আত্মহারা
 হইয়া যাই, তখন সে অন্তর্দেবতা বাহিরের দেবতা
 হইয়া—মহাপুরুষ রূপে অবতীর্ণ হইয়া বজ্র তৈরব
 নিনাদে আমাদিগকে আহ্বান করেন। তাই যখন ঋষি-
 শাস্ত্রের বার্ষ বাগ্বিত্তিরূপ বাহ্যনিনাদে বঙ্গদেশে পির
 হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ভক্তির অন্তর গোরাঙ্গদেব

অবতীর্ণ হইয়া বজ্রগজ্বীর নিনাদে জগৎকে ডাকিয়া বাহিরের শব্দস্তুপ ভেদ করিয়া ভিতরের কথা হরিধ্বনি শুনাইয়াছিলেন। তিনি ভিতরের কথা বাহিরে আনিয়া ভিতর বাহির এক করিয়া বাহ্য ন্যাপারলোলুপ সমাজকে অন্তর্দৃষ্টিশীল করিয়াছিলেন। যাহারা অবিশ্বাসী, তাহারা মহাপুরুষের আহ্বানে কর্ণপাত করে না। আমরা অবিশ্বাসী জীব, আমাদের হৃদয় অভিমানের ভরা। তপ্তে কি আমাদের গতি নাই? তাহা কি কখনও হইতে পারে? দয়াময়ের রাজ্যে অগতিরও গতি আছে। অধিকারানুসারে শাস্ত্রে সকল মার্গই বিহিত হইয়াছে। গতিহীন নিম্নাশিকারীর পক্ষে তীর্থাটনাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। যাহারা তীহার এই তীর্থাদিরূপ সদাভ্রতের ভিখারী নহেন যাহারা পরিশ্রম করিয়া স্বাচ্ছন্দ্য অন্ন পাক করিতে চাহেন তাহাদের জন্ম জ্ঞান যোগাদির পথ উন্মুক্ত আছে। আমরা জ্ঞান যোগ কন্ম, ভক্তি, এ সমস্তের কাহাকেও উপেক্ষা করিব না। এ সমস্তের মধ্যে পরম্পর কিছু মাত্র বিরোধ নাই। সম্পূর্ণ

সদ্ভাব আছে। পার্শ্বব জগতে যাহাকে বাড়ি বলিয়া
 বুঝি, তথায় আমাদের ভাই ভগিনীগণ, যেমন নাচিয়া
 কুঁদিয়া খেলিয়া বেড়ায়, সেই রূপ জ্ঞান যোগ ভক্তি
 আদি ভাই ভগিনীগণ যে গৃহে পরস্পর হাত পরাধার
 করিয়া বেড়াইতেছে, পরস্পর খীতির হাঁসি হাঁসিয়া
 সে গৃহ আলো করিতেছে, তাহাই আমাদের নিজ
 নিকেতন। নিজ দেশের পারচিত লোক ধ্রুবাদি যে
 গৃহ প্রাপ্তে নৃত্য করিতেছেন তাহাই আমাদের
 “ নিজ নিকেতন ” । প্রাণের ভাই শ্রদ্ধাদ
 যেখানে প্রেমে বিভোর হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন,
 বিশ্ববন্ধু দেবর্ষি নারদ যে গৃহে বাণা তন্ত্রীতে স্বর ধরিয়া
 গান করিতেছেন, শুক মনক মনন্দ যেখানে ছন্দ
 ছন্দে বসিয়া আছেন, বশিষ্ঠ বায়ু দী বাসাদি যেখানে
 সে গৃহের শুণ্ড ভাণ্ডারের রত্নরাশি গলি বদ্যানে সজিয়া
 দর্শন করিতেছেন সেই আমাদের নিজ নিকেতন ।
 নিজ নিকেতনে যাইতে হইলে আমরা জগতের মুখা-

পেছা করিব না। ভগ্নাশ্রয় বাহ্য জগৎকে মনের কথা
 প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতে বড় ভয় হয়। সুতরাং
 সেদিকে তাকাইব না। নিজ নিকেতনের যাত্রী মহাত্মা
 রামপ্রসাদ ষাঁহার অঞ্চল ধরিয়া আব্দার করিয়া
 বলিয়াছিলেন—

মা! আমার খেলেনা হ'ল,

বেলা গেল, সন্ধ্যা হল, আমার নিয়ে যত হল।

সেই জগৎপাতার করুণা কটাক্ষের দিকে তাকাইয়া
 আত্মন বলি মা। জীবনের সন্ধ্যা সম্মুখে উপস্থিত। দিন
 ফুরাইয়া আসিল। নিদারুণ কাল নিশি বিষম বিষমরীর
 ন্যায় আগ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। মা এ অশ্রু
 দীন সম্মানকে কোণে তুলিয়া লও। এই পথচারী
 অবোধ ছেলেকে হাতে ধরিয়া নিজ নিকেতনে লইয়া
 চল। মা। তুমি মহিষমর্দিনী হইয়া মতিমাতুরের
 উদ্ধার করিয়াছ, মা এত দয়া তোমার! পশু ও অশ্রুত
 তাহার অপিকারী হইয়াছে। দুঃখী দীন আসরা, মা
 কৃত্তারিণি! একবার গলাপ দেখিয়া নিরাশ্রয় দেখিয়া মা

হইয়া কাছে এসো ! একবার অঞ্চলে আশ্রয় লুটাইয়া দয়া
 করিয়া পল দেখাইয়া তোমার—আমার নিজ নিকেতনে
 লইয়া চল । ধ্রুব প্রহ্লাদাদি তোমার সন্তানগণ জগতে
 ভক্ত হইয়া লীলা করিতে আসিয়া ছিলেন, আর আমা-
 দের মত অভক্ত সন্তানগণ কুপথগামী হইয়া বড় যাতনা
 পাইতেছে মা ! মা লীলাময়ি ! সকলই তোমার লীলা,
 তোমার ও অনন্ত লীলা তুমিই বৃক্ষ, আর কাহারও
 বৃক্ষবার সাধ্য নাই । মা ! আর বৃক্ষিতে চাহিনা আর
 খেলা করিতে চাহি না ; মা লইয়া চল, ঘরে গিয়া
 তোমার কোলে ঘুমাইয়া পড়ি, চির স্থনে যোগনিদ্রায়
 মা যোগেশ্বরী ! বিশ্রাম করি ।

আঁধারের মাণিক ।

প্রকৃতিগুহ তব উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য মনুষ্য-
জগৎ অবিরত ব্যস্ত । প্রকৃতির অনন্ত মর্ডের—অগীম
ভাণ্ডারের প্রতি স্তর প্রতি পটে উন্মোচন করিবার জন্য
মানবজাতি গর্বদা চেষ্টা পরায়ণ । প্রকৃতিকে পূর্ণরূপে
অধিকার করিবার জন্য প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রত্ন-
রাজি সম্পূর্ণ রূপে আত্মসাৎ করিবার জন্য মনুষ্য
জীবনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংগ্রাম চলিতেছে । কিন্তু প্রকৃতির
সম্পূর্ণ তত্ত্ব কথা তিনিই বুঝিতে পারেন, যিনি প্রকৃতির
উপাসক । যিনি প্রকৃতির ভাষা বুঝিতে পারেন, প্রকৃতি
যাঁহার সহিত কথা কহেন, প্রকৃতির গভীর মাগরে
যিনি নিমগ্ন—প্রকৃতির মরম মাঝারে নান ভূবিষাচ্ছেন
তিনিই প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ হইতে, পারেন । প্রকৃতির সমস্ত
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাঁহারই কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়, যাঁহার
সহিত প্রকৃতির পূর্ণ পরিচয় জন্মিয়াছে ।

প্রাকৃতিক প্রত্যেক পদার্থেরই দুইটি পৃষ্ঠ আছে । সম্মুখ ও পশ্চাৎ বাম ও দক্ষিণ, আলো ও অন্ধকার এই দুইটি পৃষ্ঠ বিহীন কোন পদার্থই নাই । যিনি প্রকৃতির অপরিচিত, তিনি প্রকৃতির এই উভয় পৃষ্ঠ দেখিতে পাইবেন কিরূপে ? প্রকৃতির গিরাট বিশাল কলেশের সম্মুখ স্বরূপকে তিনিই জ্ঞানের আয়ত্ত করিয়াছেন, যিনি প্রকৃতিগর্ভে বিনীন হইতে পারিয়াছেন প্রকৃতির গুহ্য কথা জানিবার জন্য যিনি প্রকৃতি রাজ্যের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই আর ফিরিবেন না, স্তব্ধতাঃ প্রকৃতির ঘরের কথা বলিবার লোক এ জগতে নাই । প্রকৃতির অনেক কথা শুনিবার অনেক বিষয় দেখিবার আছে । যাহা সম্মুখে দেখিতে পাই, ইহা প্রকৃতির পূর্ব চিত্র নহে । ইহা প্রকৃতির একটি পৃষ্ঠ । প্রকৃতির অন্যপৃষ্ঠ শত সহস্র আনন্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত । শত সহস্র ব্যবধানের ভিতর দিয়া প্রকৃতির যে আভা ফুটিয়া বাহির হয়, আমরা তাহাই অনুভব করি । প্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ নিরানন্দ অনবচ্ছিন্ন

মূর্তি আমরা কখনই উপভোগ করিতে পাই না ।
 আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহা প্রতিদিশ মাত্র
 আবছায়া মাত্র । স্বরূপ তাহার নহুদরে । স্বরূপ উপভোগ
 করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই । পৃথিবীর জীব
 প্রকৃতির স্বরূপ পরিপাক করিবার অধিকারী নহে ।
 প্রকৃতির স্বরূপ দেখিতে গেলে পার্থিব চক্ষু ঝলসিয়া
 যায়, স্পর্শ করিতে গেলে ত্বক্শক্তি ভঙ্গীভূত হইয়া যায়,
 গন্ধেন্দ্রিয় সে স্বরূপের কাছে স্তম্ভিত হইয়া যায় ।
 তাই পার্থিব জীবের পক্ষে কেবল প্রকৃতির বিরূপেরই
 ব্যবস্থা ।

সূর্য্য কিরণের স্বরূপ যাহা, তাহা কে জানে ? কেই
 বা তাহার তাপ সহ্য করিতে পারে ? আকাশ ও পৃথি-
 বীর কত লক্ষ ২ পদা ভেদ করিয়া সূর্য্য রশ্মি এ জগতে
 আসিয়া পড়ে । অসংখ্য ব্যবধানের ভিতর দিয়া আসে
 বলিয়াই সূর্য্যতাপ আমাদের স্পর্শোপযোগী হইয়াছে ।
 সূর্য্যরশ্মির স্বরূপ শত সহস্র ব্যবধান স্পর্শে লীতল
 হইয়া—নিরূপ হইয়া আমাদের কাছে আসে তাই

তাহা অনুভব করিতে পারি। যদি অব্যবধানে সৃষ্টির
 খাঁটি তেজ—শুদ্ধ স্বরূপ পৃথিবীতে পড়িত তাহা হইলে
 পৃথিবী তাহা ধারণ করিতে পারিত না। পৃথিবী ভগ্নী-
 হৃত হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইত। সৃষ্টি ছারখার হইত।
 সুতরাং প্রকৃতির শুদ্ধ মূর্তি পৃথিবী সহ্য করিতে পারে
 না। প্রকৃতির নিকর লইয়াই তাহাকে সম্বলিত থাকিতে
 হয়। গোমুখী হইতে পুতঙ্গলিলা ভাগীরথী নিঃসৃত
 হইয়াছেন। কত খালবিল কত নদনদীর সহিত মিলিত
 হইয়া কত বিকারগ্রস্ত হইয়া ভাগীরথী আগাণের
 সম্মুখে আসিয়াছেন। গোমুখীর বারিধারা যেমন নির্মল
 পবিত্র, এই নদনদীর জলমিশ্রিত গঙ্গার জল তেমন
 পবিত্র তেমন নির্মল নহে। অথচ এই গঙ্গার জলকেই
 ব্যবহার করিতে পাইয়া আমরা সম্বলিত আছি। বিশুদ্ধ
 খাঁটি গঙ্গার জল টেক আমাদের অদৃষ্টে ঘটে ? সুতরাং
 প্রকৃতির স্বরূপের ধার দিয়াও আমরা যাইতে পারি
 না। বালক যেমন চাঁদ ধরিবার আশায় দৌড়িয়া যায়,
 সেইরূপ প্রকৃতিকে ধরিব বলিয়া আমরা দৌড়িয়া

যাই। আকাশের চাঁদ যেমন আকাশে থাকিয়া যান,
সেই রূপ প্রকৃতিও চিরদিনই আগাদের অধিকার-
পথের বাহিরে থাকিয়া যান। সুতরাং প্রকৃতিতত্ত্বের
একটি ক্ষুদ্র তৃণ কণিকাও সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত করা
মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। ✕

প্রকৃতির স্বরূপ তেজ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পৃথিবী ধারণ
করিতে পারে না, তাই শত ব্যবধানের ভিতর দিয়া
প্রকৃতির রশ্মিরেখা এ জগতে যাহা আসিয়া পড়ে,
তাহাষ্ট পূর্ণার্থী জীবের পক্ষ যথেষ্ট। ব্রহ্মার কমণ্ডলু
হইতে নিঃসৃত হইয়া পতিতোক্কারিণী গঙ্গা যে তেজে
সাহির হইয়া আসিয়াছিলেন, সে তেজ কি পৃথিবী
ধারণ করিতে পারে? সে তীরতেজোময়ী প্রবাহ দ্বারা
ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি প্রথমে মাথায় পাতিয়া
লইয়া ছিলেন। তবে সে প্রশান্তবেগ পৃথিবী সহ্য
করিতে পারিয়াছিল। সুতরাং অনন্ত উৎস উৎসার্ণী
প্রকৃতির প্রস্রবণ ব্যবধানের ভিতর দিয়াই এ জগতে
প্রবাহিত হইয়া পড়ে। ব্যবধানের ভিতর দিয়াই আমরা

প্রকৃতিকে দেখিতে পাই। অগ্নির যে তাপ স্পর্শ দ্বারা
 আমরা অনুভব করি, তাহা অগ্নির বিশুদ্ধ তৈজস যুতি
 নহে। বায়ুর স্পর্শে শীতল হইয়া আগ্নেয় তাপ আমাদের
 অনুভবের গোচরীভূত হয়। সুতরাং অগ্নির বিশুদ্ধ
 তৈজস যুতি কি, তাহা আমাদের জ্ঞানবার মো নাই।
 অগ্নি তাপের ভিত্তি আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু মাত্রা
 বুঝিবার সাধ্য নাই। এই রূপ কালের খাঁটি কলহও
 আমরা অনুভব করিতে পারি না। পৃথিবীর খাঁটি
 পৃথিবীও আমাদের উপভোগে আসে না। কেননা
 ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম ইহারা সকলেই পঙ্কী-
 কৃত। পঞ্চভূতের সংমিশ্রণে পরস্পর সংমিশ্রিত। সুতরাং
 খাঁটি জিনিষ উপভোগ করিবার অদৃষ্ট আমাদের
 নাই। প্রকৃতির স্বরূপ বুঝিবার সামর্থ্য আমাদের
 নাই। ব্যবধানের ভিতর দিয়া প্রকৃতির যে যুতি
 দেখিতে পাই, তাহা হ আচ্ছাদ্য—প্রতিবিম্ব মাত্র।
 প্রতিবিম্ব দেখিয়া বিন্দুর স্বরূপ কি সম্পূর্ণ রূপে
 বুঝিতে পারা যায়? নকল দেখিয়া আসলের প্রকৃতি

কি চেনা যায় ? ফটোগ্রাফে কাহারও হয় ত চমকান ধরণের ফটো উঠিল, কাহারও বা হাঁসিমাখা মুখ খানির চিত্র উঠিল। কিন্তু তাহাই কি তাহার সার্বদিক স্বরূপ ? আবার বিকৃত ফটোগ্রাফে যে প্রতিমূর্তি উঠে, তাহাও বিকারগ্রস্ত হয়। সুতরাং প্রতিকৃতি দেখিয়া প্রকৃতি চিনিবার উপায় নাই। অবিদ্যার ফটোগ্রাফে প্রকৃতির এই যে জাগতিক প্রতিমূর্তি অঙ্কিত হইয়াছে ইহা অজ্ঞানবিকার-কলঙ্কিত, সুতরাং এ প্রতিচ্ছায়া দেখিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানময়ী প্রকৃতির স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। প্রকৃতির ছায়া লইয়াই আমরা বিমোহিত। প্রকৃতির কায়ার সংস্পর্শ করিবার অধিকার আমাদের নাই।

প্রকৃতির বিচিত্র মূর্তি। এই অনন্ত অপরিণীম মূর্তিকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে হইলে আমাদের ইঞ্জিয়গণকে তত্পরযোগী করিয়া লইতে হইবে। যে বস্তু দ্বারা কোন বস্তু তত্ত্ব বুঝিতে চাই, সেই বস্তু রূপ যন্ত্রটি পরিপুষ্ট না হইলে পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব স্থিরীকৃত

হইবে না। কিন্তু আমরা সে দিকে তাকাই না। আমাদের
 বৃত্তি রূপ যন্ত্রতন্ত্রের ভাল রূপ সম্বল না থাকিলেও
 নড় ২ সিদ্ধান্তে অগ্রে গিয়া হাত দিই। জলে কীটাণু
 আছে কিনা বুঝিতে হইলে যেমন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের
 প্রয়োজন সেই রূপ প্রাকৃতিক তত্ত্ব যথার্থ রূপে বুঝিতে
 হইলে পরিপুষ্ট চিন্তাশক্তির প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক
 যন্ত্র যে কথা ঠিক করিয়া বলিয়া দেয়, তাহার যেমন
 নড়ন চড়ন হয় না, ভুল ভ্রান্তি হয় না, সেই রূপ পরি-
 পুষ্ট চিন্তাশক্তি যাহা নির্ণয় করিবে, তাহাতে আর
 পরিবর্তন হয় না, ভুল ভ্রান্তির লেশ মাত্র তাহাতে
 থাকে না। তাদৃশ পরিপুষ্ট চিন্তাশক্তি না জন্মিলে,
 অপরিপুষ্ট পরিবর্তনশীল বুদ্ধি লইয়া প্রাকৃতিক
 তত্ত্বের উন্মেষ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। পরিবর্তন-
 শীল বুদ্ধির উপর প্রাকৃতিক তত্ত্বের সিদ্ধান্তভিত্তি
 স্থাপন করা আর বালুকা স্তূপের উপর একাণ্ড কারু-
 কার্য্য খচিত অট্টালিকা নির্মাণ করা একই কথা। এই
 যে আজকাল পাশ্চাত্য দেশে জ্যোতিষতত্ত্ব সম্বন্ধে কত

মত প্রকাশিত হইতেছে সে সমস্তই এক রকম
 আন্দাজি। তাহাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিতে পারা যায়
 না। কেননা অদ্য যাহা স্বীকৃত হইবে, কল্য তাহার
 পরিবর্তন অবশ্যস্বাভাবী। ইউরোপে বর্তমান বর্ষে সে
 সত্যের আধিপত্য চলিতেছে, আগামী বর্ষে হয়ত তাহা
 কোথায় উড়িয়া গাইবে। এই রূপ অনবরত পরিবর্তন-
 শীল মত লইয়া মুখের চক্ষে ধাঁধা দেওয়া যাইতে পারে
 বটে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত পদার্থ তত্ত্ব কিছুই নিরূপিত
 হয় না। বুদ্ধির পেলায় লোককে গোলোক ধাঁধায়
 ফেলিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে সত্যের
 কিনারা কত দূর হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। লোককে
 এবং নিজের মনকে কোন রূপে বুঝাইতে পারিলেই যে
 সেই বুঝান জিনিষটা পূর্ণ সত্য হইয়া দাঁড়াইবে, এমন
 নিশ্চিত কথা কোন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক শপথ
 করিয়া বলিতে পারেন না। আজি যে মত ঠিক বলিয়া
 প্রচারিত হইল, কলাই যদি তাহা দৈনিক বলিয়া প্রতি-
 পন্ন হয়, তবে মানবের পরিবর্তনশীল বুদ্ধির উপর

কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায় ? পূর্বের মত ছিল, চন্দ্র একটা গ্রহ পদার্থ এখন কিন্তু যে মত পরিবর্তিত হইয়াছে, এখন উপগ্রহের মধ্যেই চন্দ্রকে ফেলা হইয়াছে। তখন মত ছিল, চন্দ্র আলোক বিশিষ্ট, এখন কিন্তু প্রতিপন্ন হইয়াছে, চন্দ্র নিজে আলোক শূন্য। তবে যে চন্দ্রের আলোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সূর্য্যের কাছ হইতে ধার করা। এখনকার এই মতই যে ঠিক, তাহা কে বলিল ? ত্যক্ত এমতও দিন কতক বাদে উড়িয়া যাইতে পারে। সুতরাং এমত যে ঐক্য সত্য, তাহা কেহ স্পষ্টা করিয়া বলিতে পারেন না। তবে উক্ত রূপ মতবাদীরা মূৰ্খ লোককে বুঝাইতে পারেন আশাদের এট মত যে বৈজ্ঞানিক, তাহা তুমি যখন প্রমাণিত করিতে পার না, সুতরাং তৈহা ঠিক বৈ কি ? এইখানে গোপাল ভাঁড়ের সম্বন্ধে একটা গল্প মনে হইতেছে। কোন সময় মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্রের প্রতি নবাবের হুকুম আসিল যে পৃথিবীর কোন খামটা ঠিক মধ্যস্থান, তাহা এক মাসের মধ্যে তাঁহার সভাগত পণ্ডিত

মণ্ডলী খারা ঠিক করিয়া দিতে হইবে। কৃষ্ণ চন্দ্র নবাবের
 এই খাম খেয়ালি অদ্ভুত হুকুম পাইয়া চিত্তিত হইলেন।
 বড় ২ পণ্ডিতকে উক্ত বিষয়ের একটা স্থির সিদ্ধান্ত
 করিতে নিযুক্ত করিলেন। পণ্ডিতগণ বিসম বিভ্রাটে
 পড়িলেন। পৃথিবীর মধ্যস্থল ঠিক করিতে হইলে সমগ্র
 পৃথিবী ঘুরিতে হইবে। সমগ্র পৃথিবী ঘুরিয়াও মধ্যস্থল
 ঠিক করা বড় মোজা কথা নহে। আর এক মাসের
 ভিতরেই বা কেমন করিয়া সমগ্র পৃথিবীটা ঘুরিয়া
 আসা যায় ? পণ্ডিত গণ কিছুই কূল কিনারা করিতে
 পারিলেন না। রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র বিষম চিন্তাকুল হইয়া
 উঠিলেন। রাজাকে চিন্তায় ত্রিয়মাণ দেখিয়া এক দিন
 গোপাল ভাঁড় বাপার জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা সমস্ত
 কথাই বলিলেন। গোপাল ভাঁড় তাহা শুনিয়া হাঁসিয়া
 বলিলেন, এই সামান্য বিষয়ের জন্য আপনার এত
 চূর্তাবনা কেন ? এ কথাটা এত দিন আমাকে খুলিয়া
 বলেন নাই কেন ? আপনাকে আর চিন্তা করিতে হইবে
 না। আমি পৃথিবীর মধ্য স্থান ঠিক করিয়া দিব। রাজা

গোপাল ভাঁড়কে নিশাস করিতেম। স্তব্ধতাং আর
 বিরক্তি না করিয়া গোপাল ভাঁড়কেই ঐ বিষয়ের
 ভার দিলেন। গোপাল ভাঁড় এক মাসের মধ্যেই পৃথিবী
 ঘুরিয়া মধ্যস্থান ঠিক করিলেন এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া
 রাজার কাছে হইতে ছুটি লইয়া চলিয়া গেলেন।
 গোপাল ভাঁড় নিজ গ্রামের কিয়দূরবর্তী একটা
 জঙ্গলের ভিতরে একটা খুঁটা গাড়িয়া আনিলেন। বাড়ি
 আনিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। এক মাস বাদে
 রাজার কাছে গিয়া সংবাদ দিলেন মধ্য স্থান ঠিক করা
 হইয়াছে। রাজা নবাবকে মধ্যস্থান দেখাইবার জন্য
 আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। রাজা ও নবাব পাত্র মিত্র
 সমতিব্যাহারে গোপাল ভাঁড়ের সহিত নির্দিষ্ট স্থান
 দেখিতে চলিলেন। গোপাল ভাঁড় সেই জঙ্গলের কাছে
 গিয়া বলিলেন, ঐ যে খুঁটাটি যে স্থানে পোঁতা রহিয়াছে
 উহাই পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থল। নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া
 বলিলেন, এত দেশ থাকিতে তোমার এই বাড়ির
 কাছেই পৃথিবীর মধ্যস্থল হইল? ইহা কখনই সম্ভব নয়।

তোমার মত মিথ্যাবাদীকে আমি বিশেষ রূপে শাস্তি দিব। গোপাল ভাঁড় বলিলেন আছে না। আমি মিথ্যা কথা বলিতোছি না। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, আপনি লোক দ্বারা পৃথিবীর চারি ধার মাটিয়া দেখিতে পারেন উহা ঠিক মধ্য স্থান কিনা? নবাব বিষম বিপদে পড়িলেন। গোপাল ভাঁড়ের কথা মিথ্যা প্রমাণ করিতে হইলে পৃথিবীর চারি ধার মাটিতে হয়। তাহা ত অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং অগত্যা গোপাল ভাঁড়ের কথা তাঁহাকে মানিতে হইল। নবাব অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া গেলেন।

✽ আজ কালকার যঁাহারা প্রকৃতিতত্ত্ব চিন্তাশীল বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা ঐ রূপ গোপাল ভাঁড়ের মত জগৎকে চারুগীর জালে জড়াইতে চাহেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, চন্দ্র এত হাজার যোজন বিস্তৃত। ভূমি যদি আপাত কর ইহা কেমন করিয়া হইল, তাঁহারা হরত বলিবেন, “আমাদের কথায় বিশ্বাস না হয় চন্দ্র মণ্ডলটা মাটিয়া দেখিতে পার”। কাষেই

তাহাদের এই কথায় হার মানিতে হয়। চক্ষু আলোক
 আছে কিনা এ সম্বন্ধে আপত্তি করিলে তাঁহারা হয় ত
 বলিবেন, আমরা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহা যতক্ষণ
 না ভুলি খণ্ডন করিয়া গেষ্টিক বলিয়া প্রতিশ্রুতি করিতে
 পারিতেছি, ততক্ষণ ইহা তোমাকে ঠিক বলিয়া মানি-
 তেই হইবে। তাঁহাদের এই ভীষণ আত্মপক্ষপাত ভীত
 ভৎসনায় ভীত হইয়া মূৰ্খজগৎ তাহাদের কথা শিরোধার্য্য
 করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহাদের কথা দ্রুত সত্য
 ভাবিয়া গেই পথের পথিক হইতেছে। কিন্তু তাঁহারা
 যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে অকাট্য, তাহাই যে স্বর
 সিদ্ধান্ত, তাহা কেনন করিয়া স্বীকার করিব? কেননা
 পূর্বেই বলিয়াছি অগরিপুটে মনুষ্যচিত্ত। ৮০দিনই
 পরিবর্তনশীল।

সুতরাং প্রাকৃতিক তত্ত্ব বড়ই ভয়বহ বাণী।
 প্রাকৃতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু যীমানসা কটয়াছে,
 সমস্তই অসম্পূর্ণ। আজ যে অন্ধকার ও আলোকের
 কথা বলিব ইহাও প্রাকৃতিক তত্ত্বের এক কটিল সমস্ত।

জগতের জীব অন্ধকারকে ভাল বাসে না। অন্ধকারের
 নীতৎস মূর্তি সকলেই স্রণার চক্ষে দেখিয়া থাকে।
 আলোকের দিব্যদ্ব্যতি দেখিবার জন্যই প্রত্যেক জীব
 লালায়িত। সগর্ভ পদাঘাতে সকলেই অন্ধকারকে
 জগৎ হইতে বিদায় দিতে চায়। তাই দার্শনিক দর্শ-
 নাগ্রে অন্ধকারের অন্তিমের মূল পর্য্যন্ত উৎখাত করিতে
 চান। নব্য দার্শনিক বলিয়া থাকেন, অন্ধকার বলিয়া
 কোন একটা জিনিষ নাই। আলোক না থাকিলেই
 যখন অন্ধকারের উৎপত্তি, তখন আলোকের অভাব
 চাড়া অন্ধকার আর কিছুই নহে। কিন্তু অন্ধকার বলিয়া
 যদি একটা জিনিষ না থাকিত, তাহা হইলে অন্ধকার
 এই কণাটির সৃষ্টি হইল কেমন করিয়া ? বিসয় না
 থাকিলে তাহার ভাসার উৎপত্তি হয় কেমন করিয়া ?
 বাচ্য না থাকিলে বাচকের সৃষ্টি হয় কেমন করিয়া ?
 আলোকের অভাবই অন্ধকার এ সিদ্ধান্ত বজায় রাখিতে
 হইলে, অন্ধকারের পূর্বে আলোকের অন্তিম স্বীকার
 করিতে হইবে। অথবা আলোক বিদ্যমান থাকিলে তবে

তাহার অভাব অন্ধকার এই কথা সঙ্গত হয়। আলোক বলিয়া কোন জিনিষ যদি অগ্রে প্রসিদ্ধ না থাকে, তবে কাহার অভাব অন্ধকার হইবে? সৃষ্টির প্রাক-কালে জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, ইহা আর্থাশাস্ত্র ও ইংরাজি শাস্ত্র বাইবেলেরও মত। বেদ বলিতেছেন—

তদানীং তম আসীৎ

তমসা গূঢ়মগ্নে প্রকেতম্।

বাইবেলও বলিতেছেন—

"Darkness ruled the face of the universe and God said let there be light and there was light".

সুতরাং সে সময়ে আলোকের নাম গন্ধও জগতে ছিলনা। তেমন অবস্থায় আলোক বলিয়া যখন একটা জিনিষ প্রসিদ্ধই নাই তখন কাহার অভাব অন্ধকার হইবে? যে নিজে অসিদ্ধ, সে অপরকে সিদ্ধ করিতে পারেনা। সৃষ্টির প্রাক্কালে আলোক যখন স্রষ্টা অসিদ্ধ, তখন সে নিজের অভাব রূপে অন্ধকারকে সিদ্ধ করিবে কেমন করিয়া? অন্ধকারই জগতের স্রষ্টা,

আলোক প্রকৃতি মাত্র। কেননা সৃষ্টির পূর্বে অন্ধকার
 রাজত্ব করিত, সৃষ্টির পরেও অন্ধকারই রাজত্ব করিবে
 কেবল এই পূর্বে ও পর সময়ের সন্ধিস্থলে কিছু দিনের
 জন্য আলোকের লীলা খেলা। সুতরাং অন্ধকারই ব্যাপক
 পদার্থ। সৃষ্টির পূর্বে যাহা অনাদি কাল হইতে স্থিত,
 এবং সৃষ্টির পরে যাহা অনন্ত কাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান
 থাকিবে, সেই অনাদি অনন্ত পদার্থ অন্ধকার হইল
 কি না অসৎ আর যে আলোক সৃষ্টিকালের কিয়ৎকণ
 স্থায়ী, সেই আদি অস্ত্র বিশিষ্ট কণাবিশ্রংগী আলোক
 হইল কিনা প্রকৃত সৎ পদাণ ইহা নিতাস্তই অস্বা-
 কথ্য। অন্ধকারের গর্ভ হইতেই জগৎ নিঃসৃত হইয়াছে,
 অন্ধকারের কুক্ষিতেই জগৎ বিলীন হইবে, বর্তমানেও
 জগৎ একবারে অন্ধকার বিবর্জিত নহে। সুতরাং ভূত
 ভাবনাৎ বর্তমান এই ত্রিকালব্যাপী অন্ধকারের তুলনায়
 আলোক নিতাস্তই ক্ষুদ্র পদার্থ। অন্ধকারের বিরাট
 বিশাল বিশ্বব্যাপী কলেবরের সম্মুখে আলোকের ক্ষুদ্র
 মূর্তি নিতাস্তই নগণ্য। সুতরাং এত বড় অন্ধকার কিছুই

নয় বলিয়া ভূয়া জিনিষ বলিয়া উপেক্ষার জিনিষ নহে।

• এখন অন্ধকার-তত্ত্ব একটু বিচার করিয়া দেখা যাউক। অন্ধকার জিনিষটি কি তাহা বুঝা বড় শক্ত। অন্ধকার শব্দের কেহ২ ব্যাংগতিগত এই রূপ অর্থ করেন “ অন্ধং করোতীতি অন্ধকারঃ ” অর্থাৎ যাহা জীবকে অন্ধ করে, তাহাই অন্ধকার। যাহাতে দৃষ্টিশক্তির প্রতি-
রোধ করে, তাহাই অন্ধকার। ইহাই যদি অন্ধকার শব্দের ব্যাংগতিগত অর্থ হয়, তাহা হইলে আলোকও অন্ধকার হইয়া দাঁড়ায়। খানিক ক্ষণ সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাকিলে চক্ষুজ্ঞান ব্যক্তিও অন্ধের মত হইয়া যায়। তিনি তখন চক্ষে আর কিছুই দেখিতে পান না। হুতরাং পূর্ব্বোক্ত অন্ধকারের অর্থ অনুসারে সূর্য্য-
লোককেও অন্ধকারের ভিতর ফেলিতে হয়। আবার তোমার পক্ষে সাহা অন্ধকার, অপরের পক্ষে হয় ত তাহা আলোক। তুমি মানুষ, অন্ধকারে তুমি কিছুই দেখিতে পাওনা কিন্তু একে জ্ঞান তুমি অন্ধকারকে দৃষ্টি-
শক্তির—প্রকাশ শক্তির নামক বলিয়া স্থির করিয়াছ

কেন ? তুমি যে অন্ধকারে অন্ধ হইয়া থাক, বাতুরের
 পক্ষে সেই অন্ধকারই উজ্জ্বল আলোক । তোমার পক্ষ
 যে অন্ধকার একটা বিকট পদার্থ, বাতুরের চক্ষে তাহাই
 কিন্তু পরম সুন্দর । আবার যে দিবালোকে তুমি
 দেখিতে পাও, সেই দিবালোকই বাতুরের পক্ষে ঘোর
 অন্ধকার । সুতরাং অন্ধকার যে নিতাস্তই একটা জঘন্য
 পদার্থ, তাহা কেহ শপথ করিয়া বলিতে পারেন না ।
 অন্ধকারের একটা সর্ববাদিসম্মত লক্ষণ স্থির করা
 বড়ই কঠিন। তুমি যাহাতে কিছুই দেখিতে পাওনা,
 তোমাকে যাহা অন্ধ করে, তাহাই যদি অন্ধকার হয়, তাহা
 হইলে অনেক প্রকারের আলোকেই অন্ধকারের দলে
 মিশাইয়া ফেলিতে হয় । যাহারা কেবল তৈলের
 দীপালোক সর্বদা ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহারা
 সরিসার তৈলের দীপালোকে প্রায়ই কিছুই দেখিতে
 পায় না । সুতরাং সরিসার তৈলের দীপালোক তাহার
 পক্ষে অন্ধকার । যাহারা short sighted, একটু দূরের
 পদার্থ যাহারা কিছুই দেখিতে পায় না, দূরত্ব তাহাদের

পক্ষে অন্ধকার । সুতরাং বিচার করিয়া দেখিলে
 অন্ধকারের ক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া উঠে । তুমি যে রাজির
 অন্ধকারকেই অন্ধকার বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছ,
 তাহা ঠিক নহে । যুক্তির অস্ত্রে ব্যবচ্ছেদ করিলে
 দেখিতে পাই, তোমার ঐ সন্ধীর্ণ গম্ভী পাত্র হইয়া
 অন্ধকার জগদবাপক মূর্তিতে ভাসমান । যাহা যাহার
 যে ইন্দ্রিয়ের আবরণ কারক, তাহাই তাহার পক্ষে
 অন্ধকার হইতে যদি অন্ধকারের সর্ববাদিসম্মত লক্ষণ
 হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাই জগতের সর্বত্রই
 অন্ধকার । অন্ধকারের এই সর্বভৌম ক্ষেত্রে দাঁড়াইলে
 জগৎকে অন্ধকাররাশিপরিপূরিত বলিয়া বোধ হয় ।
 জগতে যেন অন্ধকার বই আর কথা নাই । অন্ধকারের
 গভীর গর্ভে জগৎ যেন ডুবিয়া রহিয়াছে । চক্ষুর পক্ষে
 যেমন অন্ধকার, অন্যান্য বাহ্য ও অন্তরীন্দ্রিয়ের পক্ষেও
 সেই রূপ অন্ধকার জগৎকে ঘিরিয়া রহিয়াছে । আজ
 কৃষকের পক্ষে দর্শন শাস্ত্র যেমন অন্ধকার, সেই রূপ
 দার্শনিকের পক্ষেও কৃষিবিদ্যা অন্ধকার । কবিরাজের

পক্ষে জ্যোতির্বিদ্যা যেমন অন্ধকার, জ্যোতিষতত্ত্বের
পক্ষে কবিরাজি বিদ্যা সেই রূপ গম্যান অন্ধকার।
সুতরাং অন্ধকার নাই কোথায়? অন্ধকারের প্রথর
তরঙ্গ চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছে। অগৌম গগন
তল বহিরা দিগ্দিগন্ত প্রাবিত করিয়া অন্ধকার যেন
অনন্তপারায় ঢেউ খেলিয়া চলিয়াছে। অন্ধকারের
নিবিড় কালিমাস্তূপে জগৎ যেন ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায়
নিবুম ভাবে সমাহিত হইয়া রহিয়াছে। অন্ধকারমুগ্ধের
বিনাট বন্ধে জগৎ যেন বৃন্দবৃদের ন্যায় ভাগিতেছে।
এই বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের করাল দ্বাস হইতে পরিত্রাণ
পাইবার জন্য জীব জগৎ অবিরত ব্যস্ত। এই ভীষণ
কালবিভাবনী রূপ বিষমরীর আক্রমণ হইতে রক্ষা
পাইবার জন্য সকলেই ব্যাকুল। কিন্তু এ মজ্জাগত
অস্থিমগ্নগত অন্ধকারের কিছুই কৃৎসিনারা হইয়া
উঠিতেছে না।

বর্তমান উনবিংশ শতাব্দীতে সভ্যজাতি অন্ধকার
হইতে আলোকে গাইতে চায়। অন্ধকারের কুৎসিত

মূর্তি পরিহার করিয়া আলোকের ফলস্ব ছটা আলিঙ্গন
করিতে চায় । কিন্তু অগ্নির আলোক ছাড়া অন্ধকার
বিদূরিত করিবার আর কি কোন উপায় নাই ?
অন্ধকার পরিত্যাগ করিবার জন্য অগ্নিময় আলোকের
ব্যবস্থা কেন ? অগ্নিময়ী দীপশিখায় গৃহের অন্ধকার
বিদূরিত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যে সম্ভাপ আরও
বাড়িয়া উঠে, অগ্নির উগ্রতেজে প্রাণ মন যে বিকল হইয়া
উঠে । অশান্তি অন্ধকারে পীড়িত হইয়া শাস্তির ভিখারি
হইয়া বাহার চরণে শরণ লইলাম, তাহাতে যদি
অশান্তির তীব্র তাপ আরও বাড়িয়া উঠে তবে তাতা
লইয়া কি করিব ? পতঙ্গ অগ্ন্যালোকে উৎফুল্ল হইয়া
তাহাতে যেমন ঝাঁপ দিয়া পড়ে, সেই রূপ উর্নাবংশ
শতাব্দী আলোকে লক্ষ্য দিয়া পড়িতে চায় কেন ?
পুড়িয়া মরিবার জন্য নাকি ?

পূর্বেই বলিয়াছি অন্ধকারের বিকট মূর্তি সকলেই
স্বপ্নার সহিত পরিত্যাগ করিতে চায়, আলোকের
শুভ্র সুন্দর মনোমোহন ছবি দেখিবার জন্য জগতের

জীব লালায়িত । অন্ধকারের রাজত্বে কেহই বায়
 করিতে চায় না, সকলেই আলোকের সাত্রাজ্যের
 ভিখারি। অন্ধকারের জীর্ণ কঙ্কালময় আশ্রয় উঠাইয়া
 দিয়া আলোকের স্তম্ভে সিংহাসন তথায় সকলেই
 বিছাইতে চায়। অন্ধকার যেন মরণের কোণাগার,
 আলোক যেন জীবনের অমৃতভাণ্ডার, অন্ধকার যেন
 শবরাশির শ্মশান শয্যা, আলোক যেন প্রাণনশক্তির
 অকুরন্ত প্রস্রবণ। অন্ধকার যেন ভূত প্রেত পিশাচের
 লীলাস্থল, আলোক যেন মাধু মহাত্মা দেবতার
 বিরামক্ষেত্র। অন্ধকার যেন গাঢ় ঘন গভীর অরণ্যালী,
 আলোক যেন অমরাবতীর পারিজাত সহস্র সমাকীর্ণ
 নন্দন কানন। অন্ধকার ও আলোকের এই লাপই চিত্র
 জগতে অঙ্কিত হইয়াছে। পুঁতিগন্ধ পরিপূরিত কনি-
 কোটের কিনিবিনিময় সহস্র রৌরব নবকের মার
 মর্দ'ব অন্ধকারে আরোপিত হইয়াছে, আর অর্গের
 পুঞ্জীকৃত গোন্দর্গের অনন্তধারায় আলোককে বিচুসিত
 করা হইয়াছে। বীভৎস রংয়ের বোকা মাথায় লইয়া

অন্ধকার জগতের কাছে নিম্নত—স্মৃতি—পদদণ্ডিত
 ইইয়া মরমের অভিলাষবাণী ঘোষণা করিতেছে ।
 অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া মহামুহুর্তির একনিম্ন
 অশ্রুজল নিক্ষেপ করিবার লোক এজগতে কেহ আছে
 কিনা জানি না, আমরা কিন্তু অন্ধকারকে উপেক্ষার
 চক্ষে দেখিতে পারি না । অন্ধকার আলোক অপেক্ষা
 এতই তুচ্ছ এতই জঘন্য ইহা মনে করিতে পারি না ।
 একটু বিচার করিলে দেখিতে পাই অন্ধকারই এক
 প্রকার আলোকের জন্মদাতা । অন্ধকারের কোড়ে
 যে দিব্যালোক শক্তির বিকাশ হয় তাহাতে অন্ধকারকে
 সকলের বরণীয় বলিয়াই মনে হয় । শ্রোতৃগণের মধ্যে
 অনেকেই হয়ত দেখিয়াছেন, রাজির ঘোর অন্ধকারে
 খাগিক সগ তাকাইয়া থাকিলে চক্ষুর সম্মুখে দপ্ ২
 করিয়া এক রকম ফস্ফরস্ জ্বলিতে থাকে । এট
 তৈজস আলোক শক্তির জন্মদাতা অন্ধকার বই আর ত
 কেহই নহে । সৃষ্টির পূর্বের অন্ধকারই প্রথমে বিদ্যমান,
 তাহারই কৃষ্ণভেদ করিয়া আলোক নিঃসৃত হইয়াছে.

সুতরাং অন্ধকার জননী স্বরূপ, আলোক তাহার ক্রোড়ে
লালিত পালিত শিশু। অন্ধকারের মাহাত্ম্য আমরা
বুঝি না, তাই তাহাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া
থাকি। যাহারা এই অন্ধকারের মর্ম্য বুঝিতেন সেই
আর্য্য ঋষি অন্ধকারকে সাধনা রাজ্যের প্রধান
সহায় বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্রে
অমাবাস্যার ঘোর অন্ধকারে শবসাধনাদির প্রক্রিয়া
বিহিত হইয়াছে। অমাবাস্যার ঘোর অন্ধকারের
সূক্ষ্মশক্তি অবলম্বন করিয়া পিতৃগণ শ্রীক প্রত্যাশায়
আনির্ভূত হইয়া থাকেন, ইহাও শাস্ত্রের নির্দেশ। যথা
বায়ুপুরাণে—

অমাবাস্যাদিনে পাপেষু গুতথাবঃ সমাপ্রিতাঃ।

বায়ুত্বাঃ প্রবাহন্ত্যত্রাকং পিতৃগণা নৃণাম্।

সুতরাং যে অন্ধকার সাধনা-শক্তি-বিস্কুরণের
প্রধানতম সহায়, দৈবালোকশক্তির যাহা আধার,
তাহাকে আমরা ঘৃণা করি কেমন করিয়া? যোগী মখন
চক্ষু মুদিত করিয়া ধ্যানমগ্ন হয়েন, তখন তাঁহার

চারিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও সেই অন্ধকারস্তূপের
মধ্যেই তিনি পরম জ্যোতিঃ দেখিতে পান । গভীর
গিরিও হাক্ককারেই আশ্রয় স্বাধিগণ তমোপহারী অপূর্ব
চন্দ্রমার বিমল জ্যোৎস্নাচ্ছটায় এক দিন অবগাহন
করিয়াছিলেন । স্মরণ্য যে অন্ধকার সাধনা শক্তির
উন্মেষক—পবিত্র দৈবশক্তির প্রস্রবণ, তাহাকে
নিতাস্তই জঘন্যতার চিত্রে চিত্রিত করা উচিত নহে ।

+ পূর্বেই বলিয়াছি অন্ধকারের সার্বভৌম ক্ষেত্রে
দাঁড়াইলে বুঝিতে হয়, অন্ধকার বিশ্বব্যাপী । ভিতরে
বাহিরে ওত পোত ভাবে অন্ধকার বিদ্যমান । এই বিরাট
অন্ধকারকে বিদূরিত করিতে হইলে বিরাট আলোক
শারীর আয়োজন করিতে হইবে । এই বিশ্বব্যাপী অগ্নির
আলোকময়ী জ্বালামালায় অন্ধকার নিবৃত্ত হইতে
পারিবে বটে, কিন্তু তাহাতে শরীর ক্ষীণ হওয়া দূরে
থাকুক তবু তাপে আরও সম্ভাপিত হইয়া উঠিবে
যে । জ্ঞানায়ির জ্বলন্ত শিখায় অন্ধকার না হয় ঘুচিয়া
যাউক কিন্তু মনঃপ্রাণ যদি তাহাতে গরম হইয়া উঠে,

তাহার তীব্র তাপ চির বেদনাগ্রস্ত আত্মা সহ্য করিতে না পারিয়া যদি আরও সম্ভাবিত হইয়া উঠে তবে তেমন ভালোক লইয়া আগাণের প্রয়োজন কি? বাহার স্নিগ্ধ অথচ সমৃদ্ধ শান্ত অথচ দীপ্তিমান মাদুরীর ধারায় চিরদিনের আঁধার বুড়িয়া গিয়া মনঃপ্রাণ স্থলীতল হয়, ত্রিতাপতপ্ত আত্মা চিরদিনের জন্য জুড়াইয়া যায় সেই আঁধারের মানিক আমরা চাই। আমরা প্রথম সূচ্যকিরণের ভিখারী নহি, বাহার অমল মনল কিরণ-ছটায় হৃদয়গুহা ভাসিয়া অন্তরের বন্যা বহিয়া যায়, সেই অন্তর্গগন তলের মোহন পূর্ণ চন্দ্রমা যদি আগিয়া উদ্ভিত হন, তবেই ত আত্ম-চকোর তাহার প্রেমসীমূষ-পানে শান্ত হইয়া চিরদিনের জন্য কৃতকৃতার্থ হইতে পারে। তবেই ত অনাস্তির অগ্নিশিখা চিরদিনের জন্য নির্বাপন হইতে পারে।

এ গভীর অন্ধকার পূর্ণ জীবনে আঁধারের মানিকই আমাদের লক্ষ্য। ঐ সাতবাজার মন মানিককে প্রাপ্ত হইলে আর কোন মনেরই আকাঙ্ক্ষা থাকে না। এক

শ্রেনির গর্প আছে তাহার মাথায় মানিক যখন প্রজ্জ্বলিত হয়, যখন তাহার দিগন্তবিভাগী প্রভারাশি ছুরিত হয় তখন সেই প্রভার আকর্ষণী শক্তির সাহায্যে সর্প পোকা মাকড় কীট পতঙ্গাদি ধরিয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে মানিকের অপমান করা হয় । আর এক শ্রেনির গর্প আছে, তাহার মাথায় মানিক যখন প্রজ্জ্বলিত হয়, তখন সেই মানিকের প্রভায় মুগ্ধ হইয়া নড়ন চড়ন নিহীন হইয়া সে নিস্তব্ধ হইয়া থাকে । আগনার ভাণে আগনি ডুবিয়া আগনার রসে আগনি গজিয়া সে নিম্মুগ হইয়া থাকে । ইহা হইয়াই মানিকের মূলা বৃত্তে । সে মানিকের জগদ্বল্লভ উজ্জ্বল ছটায়া নিমগ্ন হইয়া নিপত নিম্পন্দ ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া থাকিতে হয়, যে মানিক প্রাপ্ত হইলে আর কিছু পাইবার বস্তু অবশিষ্ট থাকে না, আর কিছু কাননার বস্তু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেই মানিককে প্রাপ্ত হইয়া তাহার দ্বারা আবার অন্য বস্তু পাঠবার চেষ্টা নিতান্তই নিন্দনীয় । ইহা হইয়া এক সাক্ষ লক্ষ্য মানিককে প্রাপ্ত হইয়াই কৃতকৃতার্থ হইয়া যান,

মাণিককে অন্যায় পাইবার উপায় মনে করেন না, তাঁহারাই মাণিকের মধ্য বুঝেন। যাহারা ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তিকে নির্বাপাদি সুখের উপায় মনে করিয়া অগ্রসর হন, তাঁহাদের হাতেই মাণিকের অবমাননা—লাঞ্ছনা হইয়া থাকে। প্রকৃত ভক্ত অর্জুনের লক্ষ্য ভেদের ন্যায় একমাত্র মাণিকের দিকেই নিশ্চল স্থিরতর দৃষ্টি রাখিয়া তত্ত্বগণে পানিত হইয়া থাকেন। প্রকৃত প্রেমিক নির্বাপ-সুখের আশা করেন না, জীবন্মুক্তির পিণাসা তাঁহার নাই, চতুর্দর্শের কোন কলেরই তিনি প্রার্থী নহেন তিনি কেবল তাঁহার চরণ ছুঁখানির ভিখারি।

জহুরি ভিন্ন হীরকের মধ্য অনো কি বুঝিতে পারে ? বানরে কি মুক্তামালার মূল্য বুঝিতে পারে ? নিষ্ঠার কীট কি পরমায়ের রস অনুভব করিতে পারে ? নরকের কীট কি স্বর্গীয় সুখের আশ্বাদ লইতে পারে ? সেই ক্লগ আনাড়ি—অভক্ত—অপ্রেমিক কি মাণিক চিনিতে পারে ? তাই একজন কবি বলিয়াছেন—

“ দেখন মেমের ষাট চেনেনা,

যেমে ডুবতে গিয়ে ছুটি নয়ন থাকতে নয়ন মূদে হয় রে কান।

কাঠুরেতে মাণিক পেলে দোকানেতে দেয় গো কলে,
কাল পাথর বলে ।

অভিমানে মাণিক পড়ে রে বলে মহাজনে টের গেলেনা।

সামান্য দোকানদারের হাতে যদি মাণিক পড়ে, তবে সে মাণিক চাউল ওজন করিবার বাটখারা হয়, কিন্তু মহাজনের হাতে পড়িলে তিনি তাহাকে শুণ্ড কোষে কত যত্নে কত আগ্রহে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। নীরব নিষ্কলনে বসিয়া বিরলে সে শুণ্ডনিধির মাধুরী শারা পানে তিনি বিভোর হইয়া থাকেন । মণিবিশিষ্ট নিশ্চল ফণীর ন্যায় তিনি অগাধ ভাব-গম্ভীর হইয়া অচঞ্চল সমুদ্রের ন্যায় স্থিরধীর হইয়া যান। মাণিকের দিব্যদ্যুতি তরঙ্গে প্রাণ মন ভাগাইয়া তিনি আক্সহারা হইয়া যান, অঞ্চলের নিধি বুকের পনকে বুকে রাখিয়া তানকুতকুতার্থ হইয়া যান ।

ত্রিংশলাকৃতি গর্পসদৃশ কুলকুণ্ডলিনীর মন্তকোপারি মাণিক (ব্রহ্মানন্দ) অনিরন্ত গম্ভীর হইতেছে । ইহা সাত রাজার ধন । কেননা মূল্যাদি ষট্চক্র ও সহস্রারপণ্যে আধিপত্য লাভ করিয়া এই মাণিককে

প্রাপ্ত হইতে হয় । অতঃপর গৌতম কঠোর সাধনার
 কথা । এ সাধনের সাধা কঠিতে মানিক আশ্রয় লইতে
 পারিব না । কেননা আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য, ক্ষুদ্র জ্ঞান
 ক্ষুদ্র পরামায়ু । দিগন্তব্যাপী ঘোর অন্ধকারে যদি
 মানিক স্বয়ংসেব আবিস্কৃত হইয়া দেখা দেন তবেই ত
 আমাদের ভিতর ও বাহিরের সমস্ত অঁদারই ঘুচিয়া
 যাইতে পারে । আমাদের গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন জীব
 কুটিরে লুকান রতন যদি জাগ্রত হইয়া উঠেন তবেই
 ত আমাদের আশা মিটিতে পারে, চির অন্ধকারাচ্ছন্ন
 গৃহ চির উজ্জয়াত হইতে পারে । আমরা ভঁদারের
 মানিককে বৃকে করিয়া রাখিতে চাই, তাঁহার দ্বারা
 আর অণু কোন কাণ্ড করিতে চাই না । হৃদয়ের
 মনকে হৃদয়ে রাখিয়া আমরা জুড়াইতে চাই । প্রাণের
 সামগ্রীকে প্রেমের তার পরাইয়া প্রতি পুষ্পাঞ্জলি
 উপহার দিয়া গোপনে অপূর্ব মাধুরী নিরীক্ষণ করনা
 জগতের কেহ দেখেনে না জগতের কেহ শুনেনে না
 নিহিত নিহ্নন কক্ষে গে সুগার আশ্রয় লইব, ইহাই
 আমাদের বাসনা ।

পূর্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি, অন্ধকার ভূচ্চ পদার্থ
 মধ্যে, স্থানান্তরিত নহে, অনেক সময় অন্ধকার মাগনার
 সম্মিলন । জীবের ঘোর অন্ধকারেই আঁধারের মাগিক
 দেখা দিয়া থাকেন । অন্ধকারই তাঁহার বিদ্যাদ্বিত্ত
 আকর্ষণ করিয়া আনে । আধিব্যাপ্তিগত মঃমাতের
 জ্বালায়জ্বালায় নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে জীব যখন
 বাকুল হইয়া তাঁহার দিকে চায় । তখন সেই দুর্দ্দিন-
 অমানিশির মুক্কা শক্তি অলক্ষ্যন করিয়া আঁধারের
 মাগিক অবতীর্ণ হইয়া থাকেন । কি জানি আঁধারের
 সম্বন্ধ মাগিকের কি গুপ্ত সম্বন্ধ আঁধার হইলেই তিনি
 দৌড়িয়া আসেন । অন্ধকারের অভ্যস্তরেই তাঁহার
 বিমল জ্যোতি বিকশিত হয় । তাই যখন কঃমের জীবন
 কারাগারে দেবকী ও বসুদেব ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া-
 ছিলেন, সেই অন্ধকার সুপ নিদীর্ণ করিয়া আঁধারের
 মাগিক উদ্ভূত হইয়াছিলেন । সে মাগিককে গ্রাস্ত হইয়া
 দেবকী ও বসুদেবের জন্ম অশ্বাসুরের আঁধার ঘূচিয়া
 গিয়াছিল । অতীত যখন পিতার আত্মায় বিমগন

করিতে বসিয়া চারিদিক্ অন্ধকার দেখিয়াছিলেন।
 তখন বালগোপাল মূর্তিতে আঁপারের মাণিক দেখা
 দিয়াছিলেন । সুতরাং যে অন্ধকার প্রভুর উজ্জ্বল
 সত্তাকে প্রক্ষুণ্ণিত করে, জগতের চক্ষে তাহা স্থগিত
 হউক, আমরা সেই অন্ধকারে ডুবিতে চাই । আসুন
 সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করি, প্রভো ! অন্ধকারমাগরে
 আমাদেরকে নিমগ্ন করিয়া দাও ! সেই গাঢ় ঘন গভীর
 অন্ধকারে আঁপারের মাণিক হইয়া তুমি দেখা দাও !
 তোমার শতবিদ্যামাধান শতচন্দ্রনিংড়ানস্থমামাথা
 মুখখানি লইয়া একবার দেখা দাও ! নাথ ! তোমাকে
 কেমন করিয়া ডাকিতে হয় জানি না । চন্দ্র সূর্য্যকে
 যেমন না ডাকিলেও তাহারা আসে, সেই রূপ আসিয়া
 হৃদয় কন্দর উদ্ভাসিত কর ! এ দীন দুঃখীর অন্ধকারাচ্ছন্ন
 ভগ্ন মন্দিরে গুপ্ত নীলকান্ত মণি রূপে একবার উদিত
 হও । দুঃখী জীব চরিতার্থ হউন। বাউক, তাহার চির
 বিনের আঁধার যুচিয়া বাউক ।

